ভ. ফ. জেলেনিন

সবল হৃৎপিন্ডের জন্য

মির প্রকাশন
মস্কো

В. Ф. Зеленин

КАК УКРЕПИТЬ СЕРДЦЕ

Издательство «Медицина»

ভ. ফ. জেলেনিন

সবল হৃৎপিন্ডের জন্য

মির প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ : দ্বিজেন শর্মা

На языке бенгали

সূচী

মুখবন্ধ

বইয়ের লেখক হৃৎরোগের উপর ছেলে-বুড়ো সহ বহু ধরনের লোকের সমাবেশে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতাশেষে তাদের জিজ্ঞাসিত অসংখ্য প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় যে এই ব্যাপারে তাদের গভীর আগ্রহ রয়েছে। শ্রোতারা জানতে চায় কিভাবে হৃৎপিন্ডকে সবল করা যায় এবং হৃৎরক্তনালীগত রোগগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব, কী কী ক্ষতিকর প্রভাব এড়ান উচিত, এই রোগের প্রাথমিক লক্ষনগুলি কি এবং এই রোগের বৃদ্ধি ঠেকাতে কি করা উচিত।

কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে জনসাধারণের ক্ষেত্রে তথ্যাভাব ধরা পড়ে এবং উপরন্তু স্বাস্থ্যের যে 'প্রধান উৎস' শরীরচর্চা, কায়িকশ্রম, বিশ্রাম এবং খাদ্য ইত্যাদি সেই সম্পর্কেও ভুল ধারণা পরিলক্ষিত হয়।

হৃৎপিন্ড এবং রক্তনালীগুলির অপূর্ব কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আধুনিক ধ্যান-ধারণাগুলি পাঠককে অবহিত করান সহ পাঠক স্কুল ও কলেজে এসম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করেছে তা পূর্ণতর করা এবং কী উপায়ে সে এই রোগ ঠেকাতে পারে এবং শুরুতেই যাতে রোগটি বশে আনা যায় সে সম্বন্ধে পাঠক যাতে তার ডাক্তারকে সহায়তা করতে পারে — সেইজন্যই বইটি লিখিত।

অবশ্যই লক্ষণীয় যে বইটি রোগীকে তার রোগনির্ণয়ে অথবা রোগের ভয়াবহতা বুঝতে সাহায্য করবে না। বলাই বাহুল্য রোগী তার চিকিৎসা নিজে করতে পারবে না অথবা সে চেষ্টাও তার করা উচিত হবে না। পক্ষান্তরে বইটি রোগীকে তার ডাক্তারকে নিজ শারীরিক অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা দিতে, ডাক্তারের উপদেশগুলি যথাযথভাবে পালন এবং সফল চিকিৎসার অনুকূলে তার জীবনকে গঠন করতে সহায়তা যোগাবে।

আমরা বর্তমান সংস্করণে নতুন দ্রুত বিকাশমান এক বিজ্ঞান, বার্ধক্যবিদ্যা সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া উচিত বলে মনে করি। বার্ধক্যবিদ্যা হল বয়ঃবৃদ্ধির ধারা, এর বাহ্য চেহারা, রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন। বইটিতে প্রধানতঃ বার্ধক্যবিদ্যার আনুষঙ্গিক সমস্যাবলীই আলোচিত হয়েছে।

খাদ্যের অধ্যায়টি যথেষ্ট বাড়ান সহ মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যাক্তিদের রোগপ্রতিরোধক ও রোগ থেকে রক্ষাকারী খাদ্যের ভূমিকার উপরই প্রথমত বেশি জোর দিয়েছি।

হৃৎপিন্ডের অস্ত্রোপচারে যে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই লিখেছি। তবে কতগুলি জন্মগত ও অধিগত হৃদনিষ্ক্রিয়ার ধরন — যাতে বেশির ভাগ হৃৎরক্তনালীর রোগীই ভুগে থাকে — সেগুলির অস্ত্রোপচারের উপরই জোর দিয়েছি। বইয়ের অন্যান্য অধ্যায়গুলিরও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

রক্তসঞ্চালন

আমরা যদি কোন কিছুকে আমাদের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করি তবে তাহলে শ্বাসক্রিয়া। আমরা সকলে নিশ্চিন্তই জানি যে বাঁচার জন্য শ্বাসক্রিয়া অত্যাবশ্যক। জীবন্ত প্রাণী বায়ু থেকে অক্সিজেন পায় এবং এই অক্সিজেন ব্যতিরেকে বিপাকীক্রিয়া হিসাবে পরিচিত দেহে ঘটমান জটিল ও জরুরী রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি অসম্ভব হয়ে পড়ে। যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করি তখন অক্সিজেন রক্তের ভিতর প্রবেশ করে এবং ফুসফুসের ভিতর দিয়ে রক্তের দ্বারা সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়।

আমরা আরও জানি যে খাদ্য ব্যতীত বেশী দিন বাঁচা যায় না। আমাদের পরিপাক যন্ত্রগুলি খাদ্যকে সরলতর রাসায়নিক উপাদানে পরিবর্তিত করে। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি রক্তে মিশে যায় এবং রক্তের সাহায্যে সমস্ত শরীরে পরিবাহিত হয়।

ফুসফুস থেকে অক্সিজেন এবং পাকস্থলী থেকে খাদ্যের সারাংশ শরীরের সকল অঙ্গ ও কোষকলায় পরিবহনই রক্তসঞ্চালনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রক্তসঞ্চালন শরীরের কোষকলা থেকে বিপাকক্রিয়ার সময় গঠিত কার্বনডাই অক্সাইড ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর পদার্থগুলিকে অপসারিত করে রক্ত কার্বন ডাই অক্সাইডকে ফুসফুসে আনে যেখান থেকে তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যায় আর অন্যান্য অধিকাংশ ক্ষতিকর পদার্থগুলি রক্তবাহিত হয়ে কিডনিতে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে প্রস্রাবের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়।

রক্তসঞ্চালন হল সেই পথ যার মাধ্যমে অন্তস্রাবী গ্রন্থিগুলি*

---

* বহিঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে (ঘর্ম, লালা, পাকাশয় গ্রন্থি) পৃথক বিধায় এর এই নামকরণ, কারণ এগুলি ক্ষরিত রসকে সরাসরি রক্তনালীতে অর্থাৎ রক্তে ঢেলে দেয়, যেমন থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, হাইপফিসিস ইত্যাদি।

রসক্ষরণের সাহায্যে শরীরের সকল প্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা প্রভাবিত করে। এইসব গ্রন্থিনিসৃত এবং হরমোন নামে পরিচিত পদার্থ রক্তে প্রবেশ করে ও শরীরের সর্বাঙ্গে রক্তদ্বারা প্রভাবিত হয়।

উপরোক্ত বিষয় থেকে শিরা ও ধমনীর ভিতর রক্তের সর্বক্ষণ চলাচলের অপরিহার্যতা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকি ততক্ষণ একমুহূর্তও এই সঞ্চালনক্রিয়া থেমে থাকতে পারে না। সুষ্ঠু রক্তসঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীগুলির সুষ্ঠু কার্যকলাপ প্রয়োজন। আর এগুলি দিয়েই তো গঠিত হৃৎরক্তবাহতন্ত্র।

বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ড

প্রত্যেক জীববিজ্ঞানী এবং শারীরতত্ত্ববিদের পক্ষে জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা এক আকর্ষণীয় পেশা ও আনন্দকর সৌভাগ্য। আমাদের দেহের সবচেয়ে গতিশীল যন্ত্র হৃৎপিণ্ড, যা শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় থেকে কাজ শুরু করে ও সমস্ত জীবনভোর কাজ চালিয়ে যায় তাই হৃৎবিজ্ঞান — শারীরতত্ত্বের অন্যতম আকর্ষণীয় শাখা।

স্টাথিস্কোপের সাহায্যে ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের শব্দ পরীক্ষা করে চিকিৎসক বুঝতে পারেন যে ভবিষ্যৎ মানুষটির জীবন যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেলে এবং হৃৎপিণ্ড নিঃশব্দ হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের শেষ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও শেষ হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই বিজ্ঞান এগোচ্ছে এবং ওষুধ থেমে যাওয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আবার ফেরাতে পারে। হৃৎপিণ্ডের পুনরুজ্জীবনের এই সামর্থ্য কিছুটা নির্ভর করে হৃৎপিণ্ডের সেই আশ্চর্য ক্ষমতার উপর, যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে।

দেহবিচ্ছিন্ন একটি হৃৎপিণ্ডকে পুষ্টিকর রস সরবরাহক্ষম কোন বিশেষ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করলে তা নিজ স্পন্দন অব্যাহত রাখতে পারে (চিত্র 1)। এইভাবে বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপের পরীক্ষা থেকে জীবন্ত দেহে এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে উন্নততর পরীক্ষা চালানোর ক্ষেত্রে সহায়তা মেলে।

কিন্তু দেহবিচ্ছিন্ন হয়েও কেন একটি হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হতে থাকে?

কোন শক্তি এটিকে সঙ্কুচিত করে? এর বিভিন্ন অংশের সংকোচন একই তালে চলে কোন কৃৎকৌশলের সাহায্যে? হৃৎপিণ্ডের রক্ত কেন সঠিকভাবে একটা নির্দিষ্ট পথে অলিন্দ থেকে নিলয়ের দিকে চলে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমরা আমাদের পাঠকদের অবশ্যই হৃৎপিণ্ডের কাঠামো সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেব।
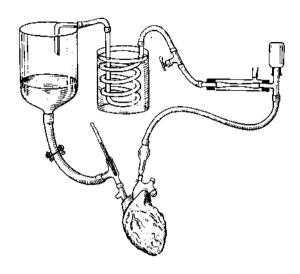
চিত্র 1. বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিপোষক তরল সঞ্চালন

হৃৎপিণ্ডের দেয়ালগুলির তিনটি আবরণ আছে। হৃৎপিণ্ডের গর্তগুলির ভিতরের ঝিল্লিকে বলা হয় এণ্ডোকার্ডিয়াম বা অন্তঃরৈদিক স্তর। হৃৎপিণ্ডের বাহিরের আবরণীটি দুটি স্তর দিয়ে গঠিত, নাম পেরিকার্ডিয়াম বা হৃদাবরণী। মাঝখানের সবচেয়ে ঘন আবরণটি হল হৃৎপিণ্ডের মূল অংশ, যাকে বলা হয় হৃৎপেশী বা মায়োকোর্ডিয়াম।

হৃৎপেশী যোজক কোষকলার পর্দা দ্বারা চারটি কক্ষে বিভক্ত: দুটি পাশাপাশি কিন্তু বিভক্ত কক্ষ। উপরের দুটিকে অলিন্দ বলা হয় এবং নিচের দুটিকে নিলয়। নিলয়ের মাংসপেশী অলিন্দের পেশী থেকে বেশী শক্তিশালী। নিলয়গুলি অলিন্দের মতই পরস্পরের সাথে কোন যোগাযোগ রাখে না। প্রত্যেকটি অলিন্দ আবার তার নিচের নিলয়ের
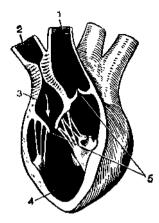
চিত্র 2. হৃৎপিন্ডের লম্বচ্ছেদ। তীরচিহ্ন দ্বারা রক্তপ্রবাহের (বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে) দিক প্রদর্শিত
1 — মহাধমনী; 2 — শিরা; 3 — বাম অলিন্দ; 4 — বাম নিলয় 5 — কপাটিকা

সাথে একটি ছিদ্র দিয়ে যুক্ত। এই ছিদ্রটির একটি কপাটিকা আছে, যা খোলে শুধু নিলয়ের দিকেই। কন্ডুরারজ্জু এই কপাটিকাগুলিকে বিপরীতে অর্থাৎ অলিন্দের দিকে খুলে যেতে দেয় না (চিত্র 2)।

বাম অলিন্দকে বাম নিলয় থেকে বিচ্ছিন্নকারী কপাটিকার আবার দুটি কোষপত্র বা চূড়া আছে। যেজন্য এটাকে দ্বিপত্রীয় বা দ্বিচূড় কপাটিকা বা সাবেকী নামে মিট্রেল কপাটিকা বলা হয়। ডান কক্ষ থেকে ডান নিলয়ের পথনিয়ন্ত্রক কপাটিকা আবার তিনটি কোষপত্র যা চূড়ায় তৈরি, সেজন্য নাম ত্রিচূড় কপাটিকা।

নিলয়গুলির মধ্যে আছে হৃৎপিন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত বৃহৎ রক্তনালী — মহাধমনী ও ফুসফুসাধিগ ধমনী সংযোজক ছিদ্র। নিলয়গুলি ও সেই রক্তনালীগুলির মধ্যেকার ছিদ্রেও কপাটিকা আছে যেগুলি শুধু রক্তনালীর দিকেই খোলে। এই কপাটিকাগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকার, সেজন্যই নাম অর্দ্ধচন্দ্র।

হৃৎপিন্ডকে চারকক্ষের একটি পাম্প বলা যেতে পারে, যার কপাটিকার বিশেষ ব্যবস্থার জন্য রক্ত কেবল একদিকেই প্রবাহিত হতে পারে — যেমন শিরা থেকে অলিন্দে, এবং অলিন্দ থেকে নিলয়ে এবং নিলয় থেকে ধমনীগুলিতে। বিচ্ছিন্ন হৃৎপিন্ডে রক্তের বদলে পুষ্টিকর পদার্থ ও অক্সিজেনপূর্ণ এক বিশেষ তরল পদার্থ সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

অলিন্দ সঙ্কুচিত হয় (অলিন্দকুঞ্চন), অলিন্দ-নিলয় দরজাটি খুলে যায় এবং তরল নিলয়গুলিতে প্রবেশ করে। নিলয়গুলি সঙ্কুচিত হলে (নিলয়কুঞ্চন) এগুলির ভিতরে বিদ্যমান তরলের চাপ বাড়ে, অলিন্দ-নিলয় কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়, নিলয় ও ধমনীর মধ্যেকার কপাটিকাগুলি খুলে যায় এবং রক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে। হৃৎপিন্ডের পেশীগুলি

প্রসারিত হলে (হৃৎপ্রসার) রক্ত এসে জমা হয় এবং নিলয় সঙ্কুচিত হলে (হৃৎকুঞ্চন) হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে যায়।

ছন্দোবদ্ধভাবে একটি নির্দিষ্ট হারে হৃৎপিন্ড স্পন্দিত হয় এবং এর প্রতিটি অংশ সর্বদাই পূর্বোক্তভাবে কুঞ্চিত হতে থাকে।

বিচ্ছিন্ন হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপ লক্ষ্য করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের মনে এই প্রশ্নগুলি জাগে: কে হৃৎপিন্ডের জটিল কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে আর এর অদৃশ্য চালকই বা কোথায় যে হৃৎপিন্ডের স্পন্দন ও মাত্রা ঠিক করে, এর কাজের পর্যায় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে — প্রথমে অলিন্দকুঞ্চন তারপর নিলয়কুঞ্চন, তারপর খানিকটা বিরতি — প্রসার,
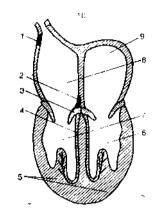
চিত্র 3. বিচ্ছিন্ন হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচন নিয়ন্ত্রক হৃদাভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া

1 — মুখ্য (সাইনো-ধামনিক) সন্ধি; 2-অধস্তন (অলিন্দ-নিলয়) সন্ধি; 3 — অলিন্দ-নিলয় পেশীগুচ্ছ ও তার শাখাগুলি (4), এবং নিলয়পেশীতে শাখায়ন (5); 6 — বাম নিলয়; 7 — ডান নিলয়; 8 — ডান অলিন্দ; 9 — বাম অলিন্দ; 10 — মহাশিরা

পরে আবার অলিন্দকুঞ্চন ইত্যাদি? বিচ্ছিন্ন হৃৎপিন্ডের কাজ কয়েক ঘন্টা ধরে কেন এত সুসমন্বিত থাকে? কিসের বলে জীবন্ত দেহে একটি হৃৎপিন্ড বহু বছর ধরে এমন সুসংবদ্ধ কাজ করতে পারে -- যে হৃৎপিন্ড রক্তবাহী শিরা ও স্নায়ু দ্বারা সমস্ত শরীরের সঙ্গে যুক্ত এবং যে নিজেকে ও সমস্ত দেহকে রক্ত সরবরাহ করে?

যে কৃৎকৌশল এমন পরিচালকের কাজ করে তা দেখান হয়েছে ৩ নং ছবিতে। আমাদের দেহের অন্যান্য পেশীর মধ্যে একমাত্র হৃৎপিন্ডেরই এই ধরণের ব্যতিক্রমী কৃৎকৌশল রয়েছে। ডান অলিন্দে হৃৎপিন্ডগামী যাবতীয় রক্তসংগ্রাহক বৃহৎ শিরার প্রবেশমুখে এক কোষপুঞ্জ রয়েছে যেগুলি কাঠামো ও গুণের দিক থেকে খুবই বিশিষ্ট ধরনের। এটা হল তথাকথিত সাইনো-অলিন্দ সন্ধি — হৃৎগত কার্যকলাপের মাত্রা ও স্পন্দনের

ম‍ূল নিয়ন্তা। এই সন্ধিই হৃৎপিণ্ডের পেশীতে উত্তেজনার (অভিঘাতের) তরঙ্গগ‍ুলি পাঠায়।

বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও মান‍ুষের ক্ষেত্রে এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সাইনো-অলিন্দ সন্ধি কখনো বেশি, কখনো-বা কম ঘন ঘন উত্তেজিত হয়ে থাকে। উক্ত সন্ধির উত্তেজনার হার শরীরের রক্তের চাহিদা সহ অন্যান্য হেতু, ম‍ূলত স্নায়‍ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লক্ষ লক্ষ বৎসরের কালপর্বে টিকে থাকার পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিটি প্রাণীজাতির অভিযোজনার মধ্য দিয়ে হৃৎসঙ্কোচনের গড়-হার বিশদীকৃত হয়েছে।

অন্যান্য সন্ধি ও যোজক 'সেতুবন্ধের' মতো সাইনো-অলিন্দ সন্ধিও দেহ থেকে প‍ৃথকীকৃত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে থাকে এবং কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত হৃৎপেশীতে অভিঘাত পাঠান অব্যাহত রেখে তার সঙ্কোচন ঘটায়।

সাইনো-অলিন্দ সন্ধি (প্রথম শ্রেণীর সন্ধি) থেকে উত্তেজনা প্রথমে অলিন্দে ছড়িয়ে পড়ে ও সেগ‍ুলির সঙ্কোচন ঘটায়। এতে লাগে প্রায় ০·১৫ সেকেন্ড। অলিন্দ থেকে উত্তেজনা অলিন্দ-নিলয় সন্ধিতে (দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্ধি) ছড়িয়ে পড়ে এবং অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত গ‍ুচ্ছে ('সেতুবন্ধ') পৌঁছয়। এই গ্রন্থি ও গ‍ুচ্ছে উত্তেজনা ছড়াতে সাধারণত লাগে প্রায় ০·১ সেকেন্ড। তারপর উত্তেজনা ছড়াতে থাকে গ‍ুচ্ছের ডান ও বাম পার্শ্বের শাখাগ‍ুলিতে এবং নিলয়-পেশীতে অবস্থিত এগ‍ুলির স‍ূক্ষ্ম শাখাগ‍ুলিতে। এর ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিলয় সঙ্কুচিত হয়। এতে লাগে ০·২৫ সেকেন্ডের কাছাকাছি।

আমাদের পেশীগ‍ুলির নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগ‍ুলি আমরা সকলেই জানি: বিভিন্ন উদ্দীপনা দিয়ে এগ‍ুলিকে উত্তেজিত করা যায়, উদ্দীপনার প্রয়োগস্থল থেকে পেশীতন্তু বরাবর আরও দ‍ূরে উত্তেজনা পরিবাহিত হয়, সঙ্কোচনের মাধ্যমে উত্তেজনায় সাড়া দেয়। হৃৎপেশীও এই সমস্ত গ‍ুণের অধিকারী। কিন্তু এগ‍ুলি ছাড়াও অন্যান্য পেশী অপেক্ষা ব্যতিক্রমী হিসাবে হৃৎপেশীতে বিশেষ পরিবাহী (অলিন্দ-নিলয় গ‍ুচ্ছ ও তারে শাখাসম‍ূহ বরাবর) দ্বারা উত্তেজনা ছড়ান যায়।

নির্দিষ্ট সময় পরে ও একটি নির্দিষ্ট ছন্দ সহ সাইনো-অলিন্দ গ্রন্থির স্বয়ংক্রিয় উত্তেজনা হল কেবল হৃৎপেশীরই একক বৈশিষ্ট্য। এজন্য বিশেষ অবস্থায়, এমন কি বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সঙ্কুচিত হতে থাকে।

স্বভাবত হৃৎপিন্ড রক্তনালী, স্নায়ুতন্ত্র ও তরল কোষকলা দ্বারা সম্পূর্ণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাতে পূর্বোক্ত কর্মপ্রক্রিয়া অটুট থাকে। অবশ্য তদুপরি হৃসঙ্কোচনের হার, ছন্দ ও শক্তি স্নায়ুতন্ত্রই নিয়ন্ত্রণ করে।

হৃৎপিন্ডগত কার্যকলাপের উপর স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব

বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ এবং কোষকলার সমন্বিত কার্যকলাপ দেহের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব বজায় রাখে। মানবদেহের সকল প্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপের এবং প্রধানত হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীগুলির চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক হল মস্তিষ্কের বহিঃস্তর বা কর্টেক্স। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ অংশগুলি, অর্থাৎ অধ-কর্টেক্স বস্তুত কর্টেক্সনিয়ন্ত্রিত। মানুষের আংশিক ইচ্ছামুক্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্য অধ-কর্টেক্সই দায়ী। তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবর্তের — সহজাত প্রবৃত্তির (পৌষ্টিক, রক্ষামূলক ইত্যাদি) বুনিয়াদ হল এই প্রতিবর্তী ক্রিয়া এবং তা আবেগ প্রকাশে — ভয়, ক্রোধ ও আনন্দ ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, পাক ও বিপাক ক্রিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অধ-কর্টেক্সের কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেহের আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ ও কোষকলাগুলির প্রত্যেকের, বিশেষভাবে হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের নিজ নিজ কেন্দ্রবিন্দু অধ-কর্টেক্সে স্থাপিত এবং এগুলি আবার ভেজিটেটিভ বা স্বশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা যুক্ত এটির দুই বিভাগের — অনুবেদী (সিমপ্যাথেটিক) ও পরি-অনুবেদী (বা ভেগাস) স্নায়ুর যে কোন একটির উত্তেজনা হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীর পরিবর্তন ঘটায়।

যেসব প্রত্যঙ্গের আরও রক্ত প্রয়োজন, সেগুলি থেকে 'সঙ্কেত' কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে যথাযথ নির্দেশ যায় হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীগুলিতে। ফলে, প্রত্যঙ্গগুলি চাহিদামতো কম বেশি রক্তের সরবরাহ পেয়ে থাকে।

ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্র হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কার্যকলাপের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অনুবেদী ও ভেগাস স্নায়ুসমূহের প্রান্তিক শাখাগুলি উপরোক্ত হৃৎপিন্ডের পেশীর পর্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এগুলির মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনের হার, ছন্দ ও শক্তিকে প্রভাবিত করে।

অনুবেদী স্নায়ুগুলির উত্তেজনা হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনের ত্বরণ বাড়ায়,

অভিঘাত হৃৎপিন্ডের পেশীর উপর দ্রুত ধাবিত হয়, রক্তনালীগুলি (হৃৎপিন্ডের ভিতরেরগুলি ছাড়া) একত্রে সঙ্কুচিত হয় এবং ধমনীর চাপ বৃদ্ধি পায়।

ভেগাস স্নায়ুর উত্তেজনা সাইনো-অলিন্দ সন্ধির উত্তেজনা কমিয়ে দেয় এবং ফলত হৃৎপিন্ডের স্পন্দনও হ্রাস পায়। তদুপরি অলিন্দ-নিলয় বান্ডিলের উপর অভিঘাত কমে যায় (কখনো কখনো যথেষ্ট পরিমাণে)। ভেগাস স্নায়ু অতি তীব্রভাবে উত্তেজিত হলে অভিঘাতটি সঞ্চালিত নাও হতে পারে। এবং ফলত অলিন্দ ও নিলয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে (হৃৎজাড্য)।

স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ হৃৎপিন্ডের উপর মধ্যম ধরনের প্রভাব বিস্তারের সময় ভেগাস স্নায়ু হৃৎপিন্ডের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করে। ই. পাভলভ বলেছেন যে ভেগাস স্নায়ুকে কতকাংশে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির স্নায়ু বলা যেতে পারে এবং তা হৃৎপিন্ডের বিশ্রামের নিয়ামক। অনুবেদী স্নায়ুতন্ত্র হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীগুলির উপর সর্বক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে এবং হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনের শক্তি ও মাত্রা সহ রক্তনালী-গহ্বরের আকারকেও প্রভাবিত করে।

বাইরের পরিবেশজাত বা খোদ দেহ থেকে আসা উত্তেজকের প্রভাবসৃষ্ট অসংখ্য প্রতিবর্তে হৃৎপিন্ড ও ধমনীগুলি শরিক হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাপ হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচন ত্বরিত করে, রক্তনালীগুলিকে স্ফীত করে। কিন্তু শৈত্য হৃৎস্পন্দন কমায়, ত্বকের রক্তনালীগুলিকে সঙ্কুচিত করে ও ফলত ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। চলাফেরা অথবা কঠোর কায়িক পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর এবং জোরাল হয়, কিন্তু বিশ্রামের সময় হৃৎপিন্ড আস্তে ও দুর্বলভাবে স্পন্দিত হতে থাকে। তলপেটে ভয়ানক জোরে ঘুসি লাগালে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারণ ঘুসির প্রতিবর্ত ভেগাস স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। দৈহিক ক্ষতজনিত তীব্র যন্ত্রনাও প্রতিবর্তী বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেগাসকে উত্তেজিত করে এবং ফলত হৃৎপিন্ড ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ভীষণ ভয়, গভীর আনন্দ এবং অন্যান্য আবেগ (কথা বা অন্যান্য উত্তেজক) উত্তেজিত গুরুমস্তিষ্কের বহিস্তর ও বহিস্তরের নীচের এলাকায়, ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্রের কোন কোন অংশে — অনুবেদী ও পরিঅনুবেদী (ভেগাসীয়) স্নায়ুতন্ত্রেও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ফলত, হৃৎপিন্ড কখনো দ্রুত কখনো ধীরে, কখনো-বা বেশি জোরে
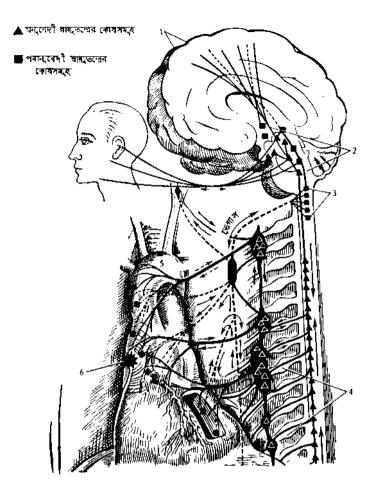
চিত্র 4. স্নায়ুতন্ত্র হৃৎসংকোচনের হার ও শক্তির উপর এবং রক্তনালীগহ্বরের আয়তনের উপর নিরন্তর ক্রিয়াশীল। চিত্রে নকশানুযায়ী স্নায়ুতন্ত্রের ভেজিটেটিভ বিভাগ প্রদর্শিত। অবিচ্ছিন্ন রেখাগুলি অনুবেদী স্নায়ুর ও বিন্দুকীর্ণ রেখাগুলি পরানুবেদী স্নায়ুর পথরেখা

1 — গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগ; 2 — উপবহির্ভাগ; 3 — ভেগাসের (পরানুবেদী স্নায়ু) কোষকেন্দ্র; 4 — কশেরুকামধ্য স্নায়ুগ্রন্থি; 5 — মহাধমনীর উপরস্থ স্নায়ুজালিকা; 6 — হৃৎপিন্ডের প্রধান সন্ধি

কখনো-বা দুর্বলভাবে স্পন্দিত হয়, রক্তনালীগুলি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় এবং মানুষের মুখ রক্তাভ বা বিবর্ণ হয়ে যায়।

এই ক্রিয়ায় সাধারণত অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি জড়িত থাকে এবং সেগুলি নিজেরাই অনুবেদী ও ভেগাস স্নায়ুর প্রভাবাধীন। প্রত্যুত্তরে সেগুলি আবার এই স্নায়ুগুলিকে নিজ হরমোন দ্বারা প্রভাবিত করে।

উপরোক্ত বিষয় থেকে হৃৎরক্তবাহতন্ত্র এবং স্নায়বিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রকগুলির মধ্যেকার বহুমুখী সংযোগ আর হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের উপর স্নায়ুর প্রবল প্রভাব সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে (চিত্র 4)।

ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্র সরাসরি মস্তিষ্কের আওতাধীন থাকে এবং মস্তিষ্ক থেকেই সর্বক্ষণ অভিঘাতপ্রবাহ স্নায়ুতন্ত্রে পৌছায় যা কখনো অনুবেদী ও কখনো ভেগাস স্নায়ুকে উত্তেজিত করে। যাবতীয় প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুমস্তিষ্কের বহিস্তরের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা এতেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় যে ওই প্রত্যঙ্গগুলির রক্তের চাহিদার নিরিখেই হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপের রকমফের ঘটে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সুস্থ হৃৎপিন্ড বিশ্রামকালে মিনিটে ৬০—৮০ বার সঙ্কুচিত হয়। হৃৎপ্রসারণ ও হৃৎসঙ্কোচনের সময় তা রক্তনালীতে ৬০—৮০ মিলিলিটার রক্ত যথাক্রমে গ্রহণ ও নিষ্কাশন করে থাকে। কায়িক শ্রমের সময় কঠিন শ্রমরত পেশীগুলির অধিকতর পরিমাণ রক্তের চাহিদার নিরিখে হৃৎপিন্ডের প্রতিটি সঙ্কোচনে হৃৎপিন্ড থেকে নিঃসৃত রক্তের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে (একজন সুশিক্ষিত খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে ২০০ মিলিমিটার বা ততোধিক)।

আমরা হৃৎপিন্ডের কাজের বর্ণনা দিয়েছি এবং কীভাবে হৃৎসঙ্কোচনের আনুপাতিক হার ও শক্তি বদলায় তাও বলেছি। কিন্তু কিভাবে সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে? কিভাবে রক্ত সারা শরীরে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়? কোন শক্তি রক্তকে একটি নির্দিষ্ট দিকে, এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে সর্বদা চালিত করে? অবিরাম রক্তপ্রবাহের জন্য রক্তনালীতে প্রয়োজনীয় চাপ কিভাবে অব্যাহত থাকে?

রক্তনালীর মধ্য দিয়েই রক্ত হৃৎপিন্ডে পৌঁছয় ও হৃৎপিন্ড ত্যাগ করে (চিত্র 5)। যেসব নালীদ্বারা রক্ত হৃৎপিন্ডে পৌঁছয় সেগুলিকে শিরা বলা হয়। ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিন্ড থেকে প্রবাহিত হয়ে ক্যাপিলারি বা কৈশিকায় (অতিসূক্ষ্ম রক্তনালী) পৌঁছয়।

নিলয় থেকে উৎপন্ন ও পূর্বোল্লিখিত কপাটিকাগুলি দ্বারা বিচ্ছিন্ন বৃহত্তম ধমনীটির নাম মহাধমনী বা অ্যাওর্টা। এই ধমনী হৃৎপিন্ডের উপরে উঠে একটি বাঁক নিয়ে নীচের দিকে মধ্যচ্ছদা (উদর ও বক্ষগহ্বরের মধ্যবর্তী পর্দা) ভেদ করে উদরগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়। ক্ষুদ্রতর ধমনীগুলি মহাধমনী থেকে উৎপন্ন হয়ে মাথা, হাত, পা, আন্তরযন্ত্রীয় প্রত্যঙ্গসমূহ ও দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে।

চিত্র 5. হৃৎপিন্ড ও হৃৎপিন্ডজাত রক্তনালীসমূহ

1 — ডান নিলয়; 2 — বাম নিলয়; 3 — ফুসফুসাধিগ ধমনী; 4 — মহাধমনী; 5 — ঊর্ধ্বমহাশিরা; 6 — নিম্নমহাশিরা

ধমনীগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখায় বিভক্ত হতে হতে শেষে আনুবীক্ষনিক হয়ে ওঠে এবং সেগুলিকে কৈশিকা বা ক্যাপিলারি (মানুষের চুলের চেয়েও সরু) বলা হয়।

কৈশিকাগুলি শিরায় মিশে যায় (চিত্র 6), নিজ ধমনীর পাশে অবস্থিত থাকে ও হৃৎপিন্ডে পৌঁছয়।

শিরাগুলি মিলিত হয়ে দুটি বড় নালীতে—ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরায় পরিণত হয় এবং দক্ষিণ অলিন্দে রক্ত বহন করে।

কাঠামোর দিক থেকে ধমনী, শিরা ও কৈশিকাগুলি পরস্পর থেকে পৃথক।

ধমনীর প্রাচীর তিনটি স্তরে বিভক্ত: অভ্যন্তরীণ, বহিস্থ ও মধ্য। অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের চওড়া কোষগর্লি রক্তলগ্ন থাকে। বহিস্থ প্রাচীর প্রধানত যোজক কোষকলা দ্বারা গঠিত। মধ্য প্রাচীর ধমনীভেদে নানারকমের হয়ে থাকে। বড় ধমনীগর্লি প্রধানত যোজক কোষকলা এবং সঙ্কোচনক্ষম অল্প পরিমাণ পেশীকোষ দ্বারা গঠিত। পক্ষান্তরে ছোট ধমনীগর্লির প্রাচীরে (চক্রাকার) পেশীতন্তুরই প্রাধান্য।
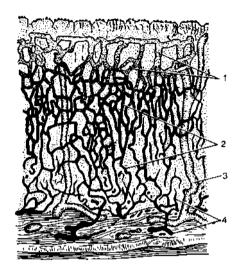
চিত্র 6. ক্ষর্দ্র ধমনীর কৈশিকায় এবং কৈশিকার ক্ষর্দ্র শিরায় রর্পান্তর
1 — কৈশিকার শিরা-শাখাঙ্গ; 2 — কৈশিকার ধমনী-শাখাঙ্গ; 3 — শিরা; 4 — অগ্রস্থ ধমনীসমূহ

ধমনীগর্লির প্রাচীরে সংজ্ঞাস্নায়র্র ডগাগর্লি থাকে। এগর্লির সাহায্যে রক্তচাপ এবং রক্তের রাসায়নিক সংযর্ক্তির সংকেত কেন্দ্রীয় স্নায়র্তন্ত্রে পৌঁছয় এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তচাপের ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণস্বরর্প, রক্তে কার্বণ ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রে সংকেত পৌঁছয়, সেখান থেকে অভিঘাত শ্বাসযন্ত্রে যায় এবং গভীরতর ও দ্রর্ততর শ্বাসক্রিয়া সৃষ্টি করে।

কৈশিকার পাতলা প্রাচীর হল ধমনীর অভ্যন্তরীণ প্রাচীরেরই সম্প্রসারণ এবং কেবল এককোষী আস্তরে গঠিত। কৈশিকাগর্লি ৫ থেকে ২০

মাইক্রন (১ মাইক্রন = ০.০০১ মি. মি.) চওড়া। কৈশিকাগ্লির পাতলা প্রাচীরের মধ্য দিয়ে অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু তরলপ্লাত কোষগ্লিকে নিষিক্ত করে এবং এই তরল থেকে কার্বণ ডাইঅক্সাইড ও কোষকলার বিপাকক্রিয়াজাত কোন কোন পদার্থ প্রবিষ্ট হয়। এখানেই রক্তের রাসায়নিক সংয্ক্তি ও রং বদলায়। ধমনীর উজ্জ্বল লাল রক্ত নীলাভ শিরারক্তে র্পবদল করে।

কৈশিকার একটি করে ধমনীগত ও শিরাগত অংশ আছে। এবং শেষোক্তটি একটি ছোট শিরা হয়ে ওঠে। ধমনীর মত কৈশিকাতেও সংজ্ঞাস্নায়্র অনেকগ্লি ডগা আছে।

ধমনীর মতো শিরারও একটি অভ্যন্তরীণ প্রাচীর রয়েছে এবং তা চ্যাপ্টা কোষ, পেশীতন্তু (লম্বালম্বি ও চক্রাকারে অবস্থিত) ও স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা গঠিত। শিরার আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের ভাঁজগ্লি কপাটিকা গঠন করে (চিত্র ৪)। রক্ত হৃৎপিন্ডের দিকে গেলে সেগ্লি খ্লে যায় এবং রক্তপ্রবাহের বিপরীত-যাত্রা আটকানোর জন্য বন্ধ হয়। শিরাগ্লি স্নায়্তন্ত্রসজ্জিত।
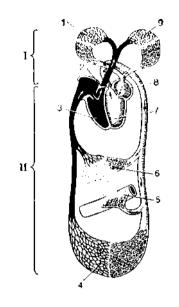
চিত্র 7. রীতিবদ্ধ (I) ও ফুসফুসাধিগ (II) রক্তসঞ্চালন (নকশা)

1 — ডান ফুসফুস; 2 — কপাটিকা-সম্হ; 3 — হৃৎপিন্ডের ডান অংশ; 4 — নানা প্রত্যঙ্গের অন্তর্গত রক্তনালীসম্হ; 5 — অন্ত্র; 6 — যকৃৎ; 7 — হৃৎপিন্ডের বাম অংশ; 8 — কপাটিকাসম্হ; 9 — বাম ফুসফুস

অলিন্দের প্রবেশম্খে মহাশিরা ও ফুসফুসাদিগ শিরার ম্খে সংজ্ঞাস্নায়্র ডগা থাকে এবং সেগ্লি শিরা-চাপের ওঠা-নামায় সাড়া দেয়। ঊর্ধ্বমহাশিরা শরীরের উপরাংশ ও হাত থেকে এবং নিম্নমহাশিরা শরীরের নিম্নাংশ, পা এবং উদরের প্রত্যঙ্গ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে।

নিম্নমহাশিরায় প্রবেশের আগে পাকস্থলী, অন্ত্র, এবং উদরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ থেকে শিরারক্ত যকৃৎ-শিরায় সঞ্চিত হয় এবং এই শিরা যকৃতের মধ্যে কৈশিকায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যকৃতের কোষকলার মধ্য দিয়ে বাহিত রক্ত অবশেষে যকৃতের শিরায় প্রবেশ করে এবং তা নিম্নমহাশিরায় পৌঁছয়।
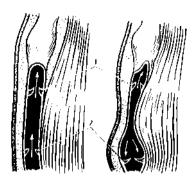
চিত্র 8. পেশীর কার্যকলাপ শিরার মধ্যে রক্তসঞ্চালন বাড়ায়
ডানে — সংকুচিত পেশী দ্বারা চাপাপিষ্ট শিরা; কপাটিকার (1 ও 2) দরুন রক্ত কেবল হৃৎপিণ্ডের দিকেই প্রবাহিত হতে পারে

বাম নিলয় থেকে ডান অলিন্দ পর্যন্ত রক্তের যাত্রাপথকে রীতিবদ্ধ সঞ্চালন বলা হয় (চিত্র 7)। এই পথে রক্তনালীগুলি ফুসফুসীয় সঞ্চালনপুষ্ট প্রত্যঙ্গগুলি ছাড়া শরীরের বৃহত্তর অংশগুলিকে রক্ত যোগায়।

ফুসফুসীয় ধমনীটি ডান নিলয় থেকে উদ্ভূত হয়। এটি কয়েকটি ছোট ধমনীতে বিভক্ত হয়ে ফুসফুসের বায়ুকোষে ঘন জালের মতো কৈশিকা গঠন করে; যেখানে শ্বাসক্রিয়ার সময় অবিরাম বায়ু বিনিময় ঘটে। ফুসফুসের কৈশিকা থেকে রক্ত ফুসফুসের শিরায় সংগৃহীত হয়ে এগুলির মধ্য দিয়ে বাম অলিন্দে পৌঁছয়। যে পথে রক্ত ডান নিলয় থেকে বাম অলিন্দে যায় তাকে ফুসফুসীয় সঞ্চালন বলা হয়।

ফুসফুসের বায়ুকোষগুলিকে জালের মতো বেষ্টনকারী ফুসফুসীয় সঞ্চালনের কৈশিকাগুলি রক্তকে শ্বাসের সঙ্গে গৃহীত বাতাসের অক্সিজেনে সম্পৃক্ত করে এবং সেখানে কার্বণ ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, যা প্রশ্বাসবায়ুর সঙ্গে ফুসফুস থেকে বাইরে আসে। ফলত এখানে ধমনীর বিধিবদ্ধ সঞ্চালনের কৈশিকায় রক্তের রাসায়নিক সংযুক্তিরও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এবার উল্টোদিকে, অর্থাৎ রক্ত পুনরায় লাল হয়ে ওঠে। এই অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে যায় ও বিধিবদ্ধ সঞ্চালনের ধমনীতে প্রবেশ করে।

সকল কোষকলা ও প্রত্যঙ্গগুলির, বিশেষত হৃৎপিণ্ডের জন্য অবিরাম

অক্সিজেন সরবরাহ অত্যাবশ্যকীয় বটে এবং কঠিন কাজে ব্যাপৃতে থাকার সময় তাদের জন্য অক্সিজেনের বাড়তি যোগান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এটা দুভাবে সম্ভবপর হয়। প্রথমত, কার্যরত প্রত্যঙ্গগুলি অতিরিক্ত রক্তের যোগানে পায়, দ্বিতীয়ত গভীরতর ও ত্বরিত শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য রক্তে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পৌঁছয়। শ্বাসক্রিয়া ও রক্তসঞ্চালন এইভাবেই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

করোনারি রক্তসঞ্চালন

হৃৎপিন্ড নিরন্তর কর্মরত। তাই যেসব প্রত্যঙ্গ মাঝেমধ্যে নিষ্ক্রিয় থাকে সেগুলির তুলনায় হৃৎপিন্ডের রক্তসরবরাহ উন্নততর হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত, মোট রীতিবদ্ধ রক্তসঞ্চালনের প্রায় ১০ শতাংশ রক্ত হৃৎপিন্ড অতিক্রম করে যায়, যদিও হৃৎপিন্ডের ওজন সমস্ত দেহের ওজনের প্রায় ০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ, অন্যান্য প্রত্যঙ্গের তুলনায় হৃৎপিন্ড গড়পড়তা প্রায় ২০ গুণ বেশি রক্ত পেয়ে থাকে।

বেশি পরিশ্রমের সময় হৃৎপিন্ড আরও বেশি রক্ত পায় (প্রায় চার বা পাঁচ গুণ)।

হৃৎপিন্ডের ধমনীগুলি তাকে যেন মুকুটের মতো ঘিরে থাকে এবং সেজন্যই এগুলির নাম করোনারি (লাতিন করোনারিয়াস অর্থাৎ মুকুটের মতো)। হৃৎৎপিন্ডের অভ্যন্তরীণ ধমনী, কৈশিকা ও শিরার মধ্য দিয়ে বাহিত রক্তপ্রবাহকে করোনারি সঞ্চালন বলা হয়। হৃৎপিন্ডে রক্তসরবরাহকারী করোনারী ধমনীগুলি রীতিবদ্ধ রক্তসঞ্চালনের একেবারে গোড়ায় মহাধমনী থেকে শাখা হিসাবে বিভক্ত হয়ে যায়।

অন্যান্য ধমনীর মতো করোনারি ধমনীগুলিও স্নায়বিক প্রভাবের অধীন। একমাত্র পার্থক্য, আমাদের দেহের প্রায় সকল ধমনী যখন অনুবেদী স্নায়ুতন্ত্রের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয় তখন হৃৎপিন্ডের ধমনীগুলির সঙ্কোচন নিয়ন্ত্রণ করে ভেগাস স্নায়ু।

রক্তচাপ

হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীর কার্যকলাপই রীতিবদ্ধ এবং ফুসফুসীয় রক্তসঞ্চালনকে অবিরাম অব্যাহত রাখে। যে পদ্ধতিতে হৃৎপিন্ড কাজ করে এবং হৃৎপিন্ডের কাজের উপর যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব কার্যকর থাকে

তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। লক্ষনীয় যে, রক্তসঞ্চালনে নিলয়গুলিই প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং অলিন্দগুলির গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম। উদাহরণস্বরূপ, অলিন্দগুলি স্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিত না হলেও মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে এবং কর্মক্ষম থাকতে পারে। হৃৎকম্প রোগে এমনটি ঘটে।

রক্তনালীর প্রাচীরগুলি স্থিতিস্থাপক। এগুলি প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হতে পারে। এদের এই বৈশিষ্ট্য শিরার মধ্যে রক্তচলাচলে সহায়তা যোগায়।

হৃৎসঙ্কোচনের যে শক্তির কল্যাণে রক্ত হৃৎপিন্ড থেকে সজোরে ধমনীতে প্রবেশ করে সেই শক্তিই রক্তচাপের শক্তিতে (ধমনীপ্রাচীরের প্রেষ) ও রক্তপ্রবাহের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সঙ্কোচনের সময় সর্বোচ্চ রক্তচাপ পরিলক্ষিত হয় বাম নিলয়ে। মহাধমনীতে রক্তচাপ থাকে সাধারণত ১৩০—১৪০ মি. মি. পারদ স্তম্ভ। মাঝারি আকারের ধমনীতে রক্তচাপ নেমে ১২০ মি. মি.-এ দাঁড়ায় এবং ক্ষুদে ধমনীগুলিতে নেমে তা তৎক্ষণাৎ ৬০—৭০ মি. মি. ও কৈশিকায় ৩০—৪০ মি. মি.-এ পৌঁছয়। ক্ষুদে শিরায় রক্তচাপ আরও নিচে নেমে যায় এবং বড় শিরায় তা ঋণাত্মক (বায়ুচাপের নিচে) হয়ে ওঠে।

বড় ধমনী থেকে রক্ত বড় শিরায় প্রবাহিত হলে রক্তচাপ এত দ্রুত নেমে যায় কেন? এটা এজন্যই ঘটে যে, ধমনীর রক্তচাপের জন্য মূলত দায়ী হৃৎসঙ্কোচনের যে শক্তি তা রক্তনালীর প্রাচীরের সঙ্গে রক্তের ঘর্ষণ এড়াতে, রক্তকোষের পারস্পরিক ঘর্ষণ এড়াতে ব্যয়িত হয়। রক্তবাহী রক্তনালীর সংখ্যা যত বেশি হয়, সেগুলির মোট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ যত বেশি হয়, ঘর্ষণ এড়ানোর জন্য শক্তি ব্যয় হয় ততই বেশি হারে। রক্ত ক্ষুদে ধমনী ও কৈশিকাগুলিতে বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হয়। এর কারণ হল, কারও কারও মতে কেবল কৈশিকাগুলিরই মোট দৈর্ঘ্য এক লক্ষ কিলোমিটার, অথচ ধমনী মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা। সেজন্যই মহাধমনী ও মহাশিরার মধ্যকার রক্তচাপের পার্থক্য এতটা বেশি।

ধমনীর প্রাচীর সঙ্কুচিত হতে পারে বলেই এতদ্বারা মূলত ধমনীর রক্তচাপ প্রভাবিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্র ধমনীর

প্রাচীরগুলিতে বিশেষত সুপুষ্ট মাংসপেশীর আবরণ থাকার জন্য রক্তচাপের উপর সেই ধমনীগুলির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্র ধমনীগুলির প্রাচীরে মাংসল আবরণের প্রেষ পরিবর্তিত হতে পারে। ক্ষুদ্র ধমনী থেকে কৈশিকায় রক্তপ্রবাহের মাত্রা কমতে বা বাড়তে পারে। ফলে, ধমনীর রক্তচাপ বাড়ে বা কমে যায়। সেজন্যই রুশ শারীরবিদ ই. সেচেনভ ক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে রক্তসঞ্চালনতন্ত্রের 'ছিপি' বলেছেন।

ধমনীত বিদ্যমান রক্তের পরিমাণও ধমনীর রক্তচাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যসব অভিন্ন থাকলে রক্ত যত বেশি হয় চাপও ততই বাড়ে।

হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের বিভিন্ন পর্যায়ে ধমনীর রক্তচাপ বেশ কিছুটা বাড়ে ও কমে। হৃৎসঙ্কোচনের (অর্থাৎ হৃৎকুঞ্চনে) সময় ধমনীর রক্তচাপ তুঙ্গে (সর্বোচ্চ চাপ) ওঠে এবং হৃৎবিস্তারের সময় (অর্থাৎ হৃৎপ্রসারনের) সময় ধমনীর রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছয়। হৃৎসঙ্কোচনের উপরে ওঠার মাত্রা নিলয়িক সঙ্কোচনের শক্তি এবং নিলয় থেকে নির্গত রক্তের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সর্বনিম্ন বা হৃৎপ্রসারণের চাপ নির্ধারিত হয় ক্ষুদ্র ধমনীর প্রাচীরস্থ প্রেষের দ্বারা।

স্বাভাবিক অবস্থায় একজন স্বাস্থ্যবান পূর্ণবয়স্ক লোকের বাহুর বড় ধমনীগুলির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন রক্তচাপ থাকে যথাক্রমে ১২০—১৪০ ও ৬০—৯০ মি. মি. পারদ স্তম্ভ।

বেদনার অনুভূতির সময় ও মাংসপেশীর কাজের সময় অসংখ্য সংজ্ঞাস্নায়ুর ডগার উত্তেজনা এবং সেইসঙ্গে চরম ভাবাবেগ, উত্তেজনা ও স্নায়বিক চাপ—এই সবই ধমনীচাপকে প্রভাবিত করে। কিন্তু সুস্থ শরীর নিজ ধমনীচাপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রক্তবাহসঙ্কোচকের ক্রিয়ায় ধমনীর রক্তচাপ বাড়লে খোদ এই চাপের পরিবর্তনই মহাধমনীর বাঁক ও ক্যারোটিড ধমনীগুলির মধ্যে অবস্থিত রক্তবাহ প্রসারকের ক্রিয়ার উত্তেজক হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত যাবতীয় প্রতিবর্তক্রিয়া গুরুমস্তিষ্কের বহিরাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেজন্য ধমনীর রক্তচাপ শর্তাধীন প্রতিবর্তক্রিয়ার জন্যও বদলাতে পারে। নিচের পরীক্ষা দ্বারা তা প্রমাণ করা যায়। যদি আমরা কিছু শব্দ সৃষ্টি করি এবং সেইসঙ্গে শরীরের চামড়ায় কয়েকবার ঠাণ্ডা লাগাই, (চামড়ায় উত্তেজনা প্রয়োগ সাধারণত ধমনীর রক্তচাপ বাড়ায়)

তাহলে পরবর্তীতে শীতল উত্তেজক ব্যতিরেকে কেবল শব্দই ধমনীর রক্তচাপ বাড়াবে। কায়িক শ্রম, মানসিক চাপ, পরিবেশের তাপমাত্রা, আবহ চাপ, বিষক্রিয়া, রোগসংক্রমণ এবং অন্যান্য কারণে স্পষ্টতই রক্তচাপ প্রভাবিত হয়।

রক্তপ্রবাহ কিভাবে সচল থাকে

নালীসমূহের ভিতর দিয়ে রক্তপ্রবাহের প্রধান চালকদের মধ্যে হৃৎপিণ্ডই অন্যতম। এটা প্রায় পুরোপুরিই একটি পাম্পের মতো কাজ করে। হৃৎপ্রসারণের সময় হৃৎপিণ্ডের শোষণক্রিয়াটি উপেক্ষণীয়।

বাম নিলয়ের প্রত্যেক সঙ্কোচন মহাধমনীতে প্রায় 60 থেকে 80 ঘন সেন্টিমিটার রক্ত ঢুকিয়ে দেয় এবং সেখানে রক্তচাপ 130—140 মি. মি. পর্যন্ত পৌঁছয়। হৃৎপিণ্ড শ্লথনের সময় মহাধমনীর চাপ 50-60 মি. মি. পর্যন্ত নেমে যায় এবং তা সর্বনিম্ন চাপের অনুরূপে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে এই চাপ ক্ষুদ্র ধমনীগুলির প্রাচীরের প্রেষ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকটি সংকোচন ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ধমনীগুলির প্রাচীরও সমতালে যথাক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। মহাধমনী থেকে ক্ষুদ্র শিরা পর্যন্ত প্রসারিত ধমনীগুলির প্রাচীরের এই ধারাবাহিক প্রসারণ ও সংকোচনকে নাড়ি-স্পন্দন বলা হয়। অতএব ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্তের গতি হল স্পন্দনশীল প্রকৃতির।

রক্তনালীর ভিতর দিয়ে যে হারে রক্ত প্রবাহিত হয় তা প্রধানত রক্তসঞ্চালনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নালিকা-গহ্বরের আয়তনের উপরই নির্ভরশীল। সকল রক্তনালীর প্রস্থচ্ছেদের পরিমাণ বাড়লে রক্ত আরও ধীরে প্রবাহিত হয় আর এই মোট পরিমাণটি কৈশিকায়ই সবচেয়ে বেশি। যথানিয়মে মহাধমনীতে রক্ত প্রতি সেকেণ্ডে 150—240 মি. মি. বা তারও বেশি হারে প্রবাহিত হয় অথচ কৈশিকায় এই পরিমাণ সেকেণ্ডে 1 মি. মি.-এর বেশি নয়।

রক্তপ্রবাহের মাত্রার এই পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোষকলা এবং প্রত্যঙ্গগুলিতে রক্তসরবরাহ করাই ধমনীগুলির একমাত্র কাজ এবং সেগুলিতে এই প্রবাহ যত দ্রুত পৌঁছয় ততই মঙ্গল। অপরপক্ষে,

কৈশিকায়, রক্ত ও কোষকলাসমূহের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিনিময় চলে। কোষকলা বা কোষরসের সঙ্গে কৈশিকার পাতলা প্রাচীরের নৈকট্য এবং কৈশিকায় রক্তপ্রবাহের ধীর গতি রক্ত থেকে কোষকলায় প্রয়োজনীয় পদার্থের, বিশেষত অক্সিজেনের চলাচলের এবং কোষকলা থেকে রক্তে অপচিতিজাত পদার্থ (অর্থাৎ কোষকলাভঙ্গজনিত কোন পদার্থ), বিশেষত কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রবেশের অনুকূলতম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

মানবদেহে বিপুলসংখ্যক কৈশিকার অবস্থিতি (কারও মতে সংখ্যাটি 100 থেকে 400 কোটি) থেকেই দেহে কৈশিকার রক্তসঞ্চালনের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কৈশিকা থেকে রক্তপ্রবাহ শিরার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে এগিয়ে চলে। হৃৎসঙ্কোচনের অবশিষ্ট শক্তি এবং শিরার অতিনিম্ন রক্তচাপ নিজ সামর্থ্যে শিরার ভিতর দিয়ে দ্রুত-রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে না। কিন্তু শিরার রক্তসঞ্চালন মূলত তথাকথিত কিছু অনুপূরক উপায় যেমন — শিরাপ্রাচীরের প্রেষ, গভীর শ্বাসক্রিয়া এবং হাঁটা, কায়িক শ্রম ও ব্যায়ামের সময় পেশীসঙ্কোচনের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সঙ্কুচিত পেশী পার্শ্ববর্তী শিরার উপর চাপ দেয়, কিন্তু পেশী প্রসারিত হলে শিরার উপরের চাপ থেমে যায় এবং শিরাগুলি পুনরায় স্ফীত হয় (চিত্র ৪)। এই প্রক্রিয়া শিরার ভিতর রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধির সুযোগ ঘটায় এবং রক্তপ্রবাহ কেবল হৃৎপিণ্ডের দিকেই ধাবিত হয় (শিরার কপাটিকা রক্তের বিপরীত গতি আটকে রাখে)। এজন্যই হাঁটার চেয়ে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশি কষ্টকর। কাজকর্ম ও কায়িক শ্রম রক্তকে শিরার ভিতর জমা হতে দেয় না, বিশেষত পায়ের শিরায়, যেখানে রক্তকে উপরের দিকে অবশ্যই প্রবাহিত হতে হয়।

গভীর শ্বাসক্রিয়াও শিরার ভিতর রক্তসঞ্চালনে সাহায্য করে। শ্বাসগ্রহণের সময় প্রসারিত বুকে রক্ত উঁচু হয়ে ওঠে, অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে আরও দ্রুত ধাবিত হয়। গভীর শ্বাসক্রিয়াও উপকারী কারণ এতে রক্ত ফুসফুসীয় কৈশিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় রক্তকে অক্সিজেনসম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য নিয়ে এখন আমরা

সংক্ষেপে আলোচনা করব। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেকক্ষণ ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য, অর্থাৎ এমনকি দেহ থেকে হৃৎপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হলেও সঙ্কুচিত হওয়ার সামর্থ্য। এটা সম্ভব হয় এজন্য যে হৃৎপেশীর আছে সন্ধি ও তন্তুগুচ্ছ যা হৃৎসঙ্কোচন নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলি আবার অক্ষত দেহের উপরও কাজ করে, কিন্তু সেগুলির কাজ থাকে সাধারণত স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে।

সকল প্রত্যঙ্গ ও কোষকলায় রক্তসরবরাহকারী হৃৎরক্তবাহতন্ত্র নানা পরিস্থিতিতে এবং দেহযন্ত্রের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে নিজকার্যকলাপ সমন্বিত করে। হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় আরও ধীরে (বিশ্রামের সময় বা শীতে),কিংবা দ্রুততর হয় (কাজের সময়, গরমে এবং চরম স্নায়বিক উত্তেজনায়) এবং কম বা বেশি জোরে (হৃৎপেশীর পুষ্টি ও তীব্রতাবৃদ্ধিকারী স্নায়ুর* শর্ত সাপেক্ষে)। রক্তনালীগুলি প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়, ত্বকের রক্তনালীগুলি শীতের প্রভাবে সঙ্কুচিত ও গরমের প্রভাবে প্রসারিত হয় এবং তা এইভাবে দেহের তাপক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে ও অটুট তাপমাত্রা অব্যাহত রাখতে সহায়তা যোগায়। অভিন্ন রক্তনালীগুলি বিভিন্ন অনুভূতি ও ভাবাবেগের নিরিখে প্রয়োজনমতো প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, লজ্জার মুখ লাল হয়ে ওঠে এবং ভয় বা রাগের সময় কুঁচকে যায়। কঠোর শ্রমরত প্রত্যঙ্গগুলির রক্তনালী স্ফীত হয়, সেগুলির ভিতরের রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ফলত সেই বিশেষ প্রত্যঙ্গটি তার কাজের জন্য অতিরিক্ত অক্সিজেন ও পুষ্টিকর পদার্থের সরবরাহ পেয়ে থাকে। বিশ্রামরত প্রত্যঙ্গগুলির বহু কৈশিকা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে এবং সেগুলিতে কোনরক্ত চলাচল করে না। ক্ষুদ্র ধমনীগুলির সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রয়োজনীয় পর্যায়ে ধমনীচাপ অব্যাহত রাখে এবং আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রক্ত সরবরাহে সহায়তা যোগায়।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্র ও সম্পূর্ণ দেহের মধ্যকার সংযোগগুলির কথা আমরা ইতিমধ্যেই সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। এই সংযোগগুলি হৃৎপিণ্ড ও

---

* পাভলভ এর আবিষ্কারক। তীব্রতাবৃদ্ধিকারক স্নায়ুর বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা দ্রুত একটি শ্রান্ত হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক আকার, স্বাভাবিক ছন্দ ও সঙ্কোচন শক্তি ফিরিয়ে আনে।

রক্তনালীগুলির কার্যকলাপের যথাযথ সমন্বয়ে শরীরকে সহায়তা দেয়। এই সংযোগগুলি প্রতিবর্তভিত্তিক যা খোদ শরীর ও বাইরের বিদ্যমান পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কার্যকলাপকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।

অল্পবয়স ও মধ্যবয়সে হৃৎরক্তবাহতন্ত্র

হৃৎরক্তবাহতন্ত্র অন্যান্য প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রের ন্যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হৃৎসঙ্কোচনের হার ও ছন্দ লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সদ্যোজাত শিশুর হৃৎপিণ্ড খুব দ্রুত স্পন্দিত হয়, প্রতি মিনিটে 120—140, পূর্ণবয়স্কের প্রায় দ্বিগুণ। প্রতিবছর এই স্পন্দনের মাত্রা কমতে থাকে এবং বিশ বছরে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌছঁয়।

শৈশবে ও যৌবনে হৃৎছন্দে অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এই বয়সে আকর্ণনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করলে কোন কোন সময়ে অল্পস্থায়ী কপাটিকার ক্ষতি বা হৃৎনিষ্ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকটিত করে না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহের কোষ ও কোষকলার অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তা পরিণামে এই প্রত্যঙ্গগুলির বিঘ্নিত কাজের রূপলাভ করে। বিপাকক্রিয়া ক্রমান্বয়ে নষ্ট হতে থাকে এবং শরীরের স্বনবায়ন প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনগুলি মধ্যবয়স্ক বিশেষত বয়স্ক লোকেদের দেহে সহজলক্ষ্য হয়ে ওঠে। জীবন্ত প্রাণীর অবক্ষয়ের, বার্ধক্যের, বিশেষত অকালবার্ধক্যের অধ্যয়নকে বার্ধক্যবিজ্ঞান অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির বিজ্ঞান বলা হয়। জরাবিদ্যা হল বার্ধক্যবিজ্ঞানের একটি শাখা এবং মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক লোকদের রোগবারক ও রোগনিরাময়ের উপায় গবেষণাই এর উদ্দীষ্ট। উল্লেখ্য যে, জরাবিদ্যার, বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের বয়স্কতার সমস্যাগুলি সর্বদাই রাশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। (ম. লমোনসভ লিখিত 'রুশ জনগণের বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা' রাশিয়ায় এই বিষয়ে লিখিত অন্যতম প্রথম গ্রন্থ)।

ই. মেশনিকভ, ই. পাভলভ ও আ. বোগামোলেতসকে আধুনিক বার্ধক্যবিজ্ঞানের প্রবর্তক হিসেবে ধরা হয়।

রোগপ্রক্রিয়ামুক্ত স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় বার্ধক্য এবং ধমনীকাঠিন্য, রক্তচাপাধিক্য, শ্বাসার্তি ও হৃৎপেশীভঙ্গ সহ রোগবিকৃত বার্ধক্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে (পরে রোগগুলি খুঁটিনাটিসহ বর্ণিত হয়েছে)।

জরাবিদ্যার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা — কর্মক্ষম জীবনের মেয়াদ বাড়ান এবং মধ্য ও বৃদ্ধবয়সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোগগুলি প্রতিরোধ — নিয়ে গবেষণা বিশেষত এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশ, বার্ধক্যপ্রক্রিয়ার উপর আবহাওয়া, শ্রমশর্ত, জীবনযাত্রার ধরন, খাদ্য, দেহকাঠিন্য ইত্যাদি বহু হেতুর প্রভাব সহ বার্ধক্যবিদ্যার বহু সমস্যা নিয়ে এদেশের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক গবেষণা চলছে।

জরাবিদ্যা আমাদের অনেকগুলি কৌতূহলপ্রদ তথ্য যুগিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জারের রাশিয়ায় যেখানে লোকের গড়-আয়ু ছিল 32 বছর, আজ সেখানে তা 68 বছরে পৌঁছেছে। 1939 সালে রুশ ফেডারেশনে 60 বৎসরোর্ধ লোক ছিল 6.7 শতাংশ, 1959-র 15 জানুয়ারী সংখ্যাটি পৌঁছয় 9.4 শতাংশে এবং তন্মধ্যে 70 বৎসরাধিক বয়সী লোকের সংখ্যা 80 লক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা এখন 2 কোটি 5 লক্ষ

প্রতিবেশগত অবস্থা (পাহাড়ী বাতাস, রোদে থাকা, সঠিক স্বাস্থ্যকর খাদ্য) দীর্ঘায়ুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছোট দেশ আবখাজিয়ায় (ট্রান্সককেশাস) 1959 সালে আশি-ঊর্ধ্ব বয়সীর সংখ্যা ছিল 4004। সেখানকার 100 জন বৃদ্ধের (যাদের বয়স 80 থেকে 116 বছর ও 4 জনের বয়স 100-এর উপরে) মধ্যে 67 জন পুরোপুরি স্বাস্থ্যবান এবং অবশিষ্ট মাত্র 33 জনের ছিল উচ্চরক্তচাপ, বুকের ব্যথা ইত্যাদি রোগের লক্ষণ।

দীর্ঘায়ুর ক্ষেত্রে আবখাজিয়ার অগ্রাধিকার থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিনের আরও বহু এলাকায়, যথা ইউক্রেন, বেলোরাশিয়া, আলতাই অঞ্চল, ইয়াকুতিয়া (সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য) প্রভৃতি স্থানেও 90 বছরের ঊর্ধ্ববয়সী বেশ কিছু সংখ্যক লোক আছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা (আ. বগমালৎস প্রমুখ) মনে করেন যে মানুষ 150 বছরও বাঁচতে পারে। আবখাজিয়ার মাখমুদ এসামবায়েভ 150 বছর বেঁচেছিলেন।

যাহোক, অধিকাংশ লোকই অল্পবয়সে বুড়ো হয়। কম লোকই অসুস্থ না হয়ে প্রধানত বার্ধক্যের নিত্যদিনের মারাত্মক সঙ্গী হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত না হয়ে স্বাভাবিক (শারীরবৃত্তীয়) সীমানায় পৌঁছয়।

অকালবার্ধক্য এড়ান এবং কর্মক্ষম জীবনের পূর্বশর্ত হল জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতির উন্নয়ন, পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতির প্রচলন। অধিকন্তু, জলবায়ুর অবস্থা, জীবনযাপন পদ্ধতি, কাজের শর্ত এবং অন্যান্য পরিবেশগত উপাদান যাই হোক না কেন, নিজের স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষত হৃৎপিণ্ডের অবস্থার জন্য মানুষ আসলে নিজেই দায়ী। খাদ্যের প্রাথমিক নিয়মগুলি পালনে ও স্বাভাবিক জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে অমনোযোগী ব্যক্তির নিয়তি হল অসুস্থতা, অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যু।

অকালবার্ধক্যের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া ও স্বাস্থ্যবান, হর্ষোৎফুল্ল, কর্মচঞ্চল বার্ধক্য লাভ করা মানুষের নিজের উপরই নির্ভর করে।

বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার সহায়ক বিষয়গুলি মাঝেমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্র পরীক্ষার প্রণালী

আজকাল প্রচলিত হৃৎরক্তবাহতন্ত্র পরীক্ষার অনেকগুলি পদ্ধতিই চিকিৎসকরা ব্যবহার করতে পারেন এবং শুধু রোগনির্ণয়েই নয়, পদ্ধতিগুলি রোগ প্রতিরোধেও ব্যবহার্য। উদাহরণস্বরূপ, হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের উপর শরীরচর্চার ফল ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করে ডাক্তার প্রয়োজনমত ব্যায়ামের মাত্রা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। কোন ব্যক্তির হৃৎরক্তবাহন্ত্রের বিশেষত্বগুলি এবং বড় ধরনের চাপ সহ্য করার ব্যাপারে তার ক্ষমতা সযত্নে পরীক্ষা করে ডাক্তার সঠিক সময়ে ব্যায়ামের পরিমাণ বদলে দিতে ও পেশা নির্বাচন সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন।

হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার তথাকথিত বিষয়গত পদ্ধতির সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর কার্যকলাপ (ধমনীর রক্তচাপের মাত্রা, হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা ইত্যাদি) কাগজে অথবা ফিল্মে লিপিবদ্ধ বা সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়। কিন্তু, তাছাড়াও ডাক্তার কোন ব্যক্তির অনুভবের ধরন (তার বিষয়ীগত সংবেদন) বুঝতে পারেন। সাধারণত একজন সুস্থ ব্যক্তি বিশ্রামের বা

সহজ ও অভ্যস্ত কাজের সময় তার হৃৎপিণ্ড 'অনুভব' করে না। কিন্তু কোন শ্রমসাধ্য কায়িক শ্রমের শেষে (দ্রুত দৌড়, ভারোত্তলন) স্বাস্থ্যবান লোকও মাঝারি ধরনের হৃৎস্পন্দন ও কিছুটা শ্বাসকষ্ট অনুভব করে। এমতাবস্থায় তার শ্বাসপ্রশ্বাস সাধারণত দ্রুততর ও গভীরতর হয়ে ওঠে।

কখনো কখনো রোগী বিশ্রামের সময়ও বুক ধড়ফড় ও শ্বাসকষ্টের কথা বলে এবং জানায় যে, সে পূর্বে কখনো এটা লক্ষ্য করে নি। কখনো তার বুকে অথবা হৃৎপিণ্ডে ব্যথা হয় কিংবা লক্ষ্য করে যে, সে খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে যেন তার দক্ষতা কমেছে, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে, ঘুমও খুব কমে গেছে। এইসব বিষয়ীগত সংবেদন বিভিন্ন রোগে যেমন, রক্তহীনতা, স্নায়ুপীড়া, কোন কোন ভিটামিনের অভাবজনিত পুষ্টিহীনতা ইত্যাদিতেও লক্ষ্য করা যেতে পারে। হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটলেও এইসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হলে এগুলিকে বিষয়গতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু এইসব পরীক্ষার আগে রোগীকে তার জীবনযাপন প্রণালী, জীবিকা, অতীত জীবন এবং অতীত রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কারণ মানুষের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, (বিশেষত নানা প্রত্যঙ্গের রোগজনিত পরিবর্তন), হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কার্যকলাপের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

বিষয়গত পরীক্ষা সাধারণত রোগী-দেখা দিয়েই শুরু হয়। চামড়ার রং (নীল অথবা ফেকাশে) রক্তনালীগুলির অতিরিক্ত স্পন্দন প্রকটিত করে। ফোলা পা থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই হৃৎপিণ্ডের অসুখ ধরা পড়ে। বুকের স্পর্শপরীক্ষায় সহজেই হৃৎস্পন্দন জানা যায়। হৃৎস্পন্দন স্বভাবতই বাম নিলয়ের সংকোচনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় তা হৃৎপিণ্ডের বাম সীমান্তের একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়। ধমনীর স্পর্শপরীক্ষা দ্বারা ধমনীপ্রাচীরের কাঠিন্য ও স্পন্দনের বিশেষত্বগুলি জানা সম্ভব।

বুকের উপর টোকা দিয়ে হৃৎপিণ্ডের আকার নির্ণয় করা যায়। সরাসরি অঙ্গুলি দিয়ে অথবা পরোক্ষে (কোন যন্ত্র দ্বারা) টোকা দিলে বুকে কাঁপুনি সৃষ্টি হয় এবং তা বায়ুপূর্ণ ফুসফুসে তীক্ষ্ন শব্দ আর বায়ুহীন হৃৎপিণ্ডের উপর একটা ভোঁতা শব্দ সৃষ্টি করে।

হৃৎপিণ্ডের গঠন এবং আকার নির্ভুলতরভাবে এক্সরে ফ্লোরিস্কোপিক পরীক্ষার সাহায্যে জানা যায়। এক্সরেগুলি হৃৎপিণ্ডের নিবিড় কোষকলার তুলনায় ফুসফুসের ভিতর দিয়ে আরও ভালভাবে যাওয়ার ফলে ফুসফুসের হালকা পটভূমিকায় গাঢ় ছায়া হিসাবে হৃৎপিণ্ডকে খুবই স্পষ্ট দেখায়। এক্সরেতে আরও দেখা যায় মহাধমনী, যার ছায়া ফুসফুসাদিগ ধমনীর ছায়ার সঙ্গে একত্রে হৃৎপিণ্ডের গোলাকার ছায়ার উপরে উঠে যায়। পিঞ্জরাস্থিগুলিও কালো বাঁক হিসাবে পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে। কিভাবে হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয় — তার সঙ্কোচন ও প্রসারণ সহ তার অবস্থানের যে সামান্য বদল ঘটে — এক্সরে তা পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। ফ্লোরিস্কোপিক পরীক্ষার সময় হৃৎপিণ্ডের ছবি নিগেটিভের আকারে ফিল্মে তুলে রাখা যায়।

চিত্র 9. শরীরের উপর হৃৎ-জৈবতড়িতের শর্তাধীন তড়িৎশক্তির বিন্যাস। প্রতিটি বিন্দুকীর্ণ রেখা সমান শক্তিসম্পন্ন দেহতলকে যুক্ত করেছে। বিভিন্ন শক্তির দেহতলের জায়গাগুলিকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফের সঙ্গে যুক্ত করলে হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপজনিত এইসব শক্তির মাত্রাভেদ সনাক্ত এবং লিপিবদ্ধ করা যায়

ফ্লোরিস্কোপিক পরীক্ষার সময় স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বিচ্যুতি ধরা পড়লে তাতে রোগীর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, এতদ্দ্বারা অনেক সময় অসুখ বোঝায় না। উদাহরণস্বরূপ, হৃৎপিণ্ডের অনুভূমিক (অর্ধশয়ান) অবস্থা হল সাধারণত উচ্চ মধ্যচ্ছদার জন্য, যার গম্বুজমধ্যে হৃৎপিণ্ডটি অবস্থিত। অপেক্ষাকৃত ছোট হৃৎপিণ্ডও অসুস্থতা বোঝায় না। কারণ তা প্রায়শই নিচু মধ্যচ্ছদার ও হৃৎপিণ্ডের লম্বালম্বি অবস্থানের মোকাবিলা করে।

পুরো হৃৎপিণ্ডের আকারের অথবা এর কোন বিশেষ গহ্বরের (অলিন্দ ও নিলয়) উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সর্বদাই হৃৎরোগের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যদিও

সামান্য বৃদ্ধি (হৃৎপেশীর ঘনত্বজনিত কারণে) কোন কোন সময় অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান লোকের মধ্যেও দেখা যায়।

হৃৎপেশীর সঙ্কোচন ও কপাটিকাগুলির চাপের (বন্ধ হওয়ার উপর) সঙ্গে কিছু শব্দ যুক্ত থাকে। এটাই হৃৎস্পন্দন। দুটি হৃৎস্পন্দনই শোনা যায়। প্রথমটি, বস্তুত দুটি শব্দের সমাহার: অলিন্দসঙ্কোচন ও পরবর্তী নিলয়সঙ্কোচন এবং অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার শব্দ। এটি একটি শব্দ হিসাবেই শোনা যায়। কারণ এই দুই শব্দের মধ্যবর্তী বিরামের সময় মাত্র মিনিটের এক-ষষ্ঠাংশ এবং তা মানুষের কানে ধরা পড়ে না।

দ্বিতীয় শব্দটি মহাধমনী ও ফুসফুসাদিগ ধমনীর কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়া থেকে উৎপন্ন।

হৃৎস্পন্দনের পরিবর্তন থেকে কপাটিকাগুলির অবস্থা অর্থাৎ সম্ভাব্য হৃৎনিষ্ক্রিয়া নির্ধারণ করা যায়। যে-পরিমাণ রক্তচাপে কপাটিকাগুলি বন্ধ হয় তারও মোটামুটি মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়। নষ্ট কপাটিকা প্রায়ই স্পষ্ট শব্দের পরিবর্তে মর্মরধ্বনি সৃষ্টি করে।

রোগীর বুকে কান লাগিয়ে হৃৎস্পন্দন শোনা গেলেও এজন্য সাধারণত স্টেথিসকোপ ব্যবহৃত হয়। এক বিশেষ যন্ত্রের (ফনোকার্ডিওগ্রাফ) সাহায্যে হৃৎস্পন্দন টেপে লিপিবদ্ধ করা চলে (চিত্র 10)।

চিত্র 10. উপরে — কার্ডিওফনোগ্রাম; মধ্যে — ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম; নিচে — সমান সময়ের বিরতি

I ও II — প্রথম ও দ্বিতীয় হৃৎ-টোন; P — অলিন্দগুলির উত্তেজনা; Q, R, S, T — নিলয়গুলির উত্তেজনা; T-P — বিরতি

হৃৎস্পন্দনের হার ও ছন্দ (অর্থাৎ নিয়মিত বা অনিয়মিত যেভাবেই হৃৎসংকোচন পরস্পরকে অনুসরণ করে) নানাভাবে পরীক্ষা করা যায়। হৃৎসঙ্কোচনের সংখ্যা গোনা যায় রোগীর বুকে আকর্ণনের সাহায্যে (হৃৎস্পন্দনের দ্বারা), বুকের ধড়ফড়ানি, এমনকি বুকপরীক্ষা দ্বারাও (যদি হৃৎস্পন্দন দেখা যায় বা স্পর্শ থেকে বোঝা যায়)। সাধারণত ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করেন। তা থেকে ধমনীতে বিদ্যমান রক্তের পরিমাণ, ধমনীপ্রাচীরের প্রেষ (অর্থাৎ ধমনী-চাপ) ও স্পন্দনের হার বোঝা যায়।

নিয়মবহির্ভূত অর্থাৎ অকালীয় ও অনিয়মিত হৃৎসঙ্কোচনের পর দীর্ঘ বিরতি সহ হৃৎ-ছন্দের বিঘ্নের ধরনই খুব বেশি দেখা যায়, যাতে রোগী হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বুকের স্বাভাবিকের চেয়ে কঠিনতর আঘাত অনুভব করে এবং ফলত হৃৎপিণ্ডে শূন্যতাসহ কখনো কখনো কিছুটা মাথা-ঘোরা দেখা দেয়। কোন কোন রোগী হৃৎপিণ্ডের এই তীক্ষ্ম সংঘাতকে, অন্যরা হৃৎপিণ্ডের শূন্যতাকে ভয় পেয়ে থাকে।

প্রায়শই কোন কোন রোগী এইসব ব্যতিক্রম লক্ষ্য করতে পারে না। আবার অন্যরা ঠিক এইজন্যই ভীত হয়ে পড়ে। সাধারণত এইসব অনিয়ম দ্বারা হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের ভয়ানক বিশৃঙ্খলা বোঝা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিছুটা দুর্বল, কখনো কখনো সুস্থ সবল হৃৎপেশীওয়ালা ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্রের আত্যন্তিক উত্তেজনা-প্রবণতার জন্যই এমনটি ঘটে।

কিছু কিছু হৃৎরোগে হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত কার্যকলাপ ও হৃৎপেশীর রোগাবস্থা সর্বদাই দেখা যায়: এতে অলিন্দ সঙ্কুচিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে কাঁপে, আর নিলয়গুলি অনিয়মিতভাবে সঙ্কুচিত হয়। এই রোগকে হৃৎকম্প বলা হয়। রক্তসঞ্চালনে অলিন্দের ভূমিকা গৌণ বিধায় হৃৎকম্পরোগী বহু বছর স্বাভাবিক কাজ চালাতে ও জীবনভোগ করতে পারে।

যে তন্তুগুচ্ছের ভিতর দিয়ে উত্তেজনা অলিন্দ থেকে নিলয়তে পৌঁছয় (চিত্র 3) সেই গুচ্ছে ক্ষত থাকলে তা অলিন্দ ও নিলয়ের সমন্বিত কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটায়, অলিন্দ স্বাভাবিকভাবেই (মিনিটে 60—70 বার) এবং নিলয়গুলি এর অর্ধেক মাত্রায় (মিনিটে 30—35 বার) সঙ্কুচিত হয়।

এই বিরল রোগটি হল হৃৎ-রোধ বা হার্টব্লক।

হৃৎপেশীর (যেকোন উত্তেজনাশীল কোষকলা, যেমন স্নায়ুকলার মতো) কর্মক্ষম অবস্থার সঙ্গে জড়িত বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপের সঠিক ধারণা দিতে পারে। হৃৎপেশীর উত্তেজিত অংশ তড়িৎ-ঋণাত্মক অর্থাৎ ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত, আর বিশ্রামরত হৃৎপেশীর অংশ ধনাত্মক বৈদ্যুতিক আধানধারী। এভাবে হৃৎপেশীর কর্মরত ও বিশ্রামরত দুই অংশের মধ্যে বিভবের ব্যবধান থাকে; যা থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ, তথাকথিত কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

উত্তেজনা-প্রবাহ হৃৎপেশীর উপর ছড়িয়ে পড়ার ফলে হৃৎপেশীর বিভিন্ন অংশ ক্রমানুসারে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হয়ে ওঠে। হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন অংশের বিভবের ছন্দানুগ পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎ তার দিকপরিবর্তন করে।

হৃৎপিন্ড থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ চতুর্দিকের কোষকলায় ছড়িয়ে পড়ে ও ত্বক পর্যন্ত পৌঁছয় এবং ত্বকের বিভিন্ন অংশ ভিন্নধর্মী বিভব অর্জন করে (চিত্র 9)। ত্বকের বিভিন্ন বিভবধর অংশকে (যেমন, বাহু, পা, বুকের বিভিন্ন অংশ) লেড (ধাতু তারযুক্ত ব্যান্ডেজ বা অনুরূপ কিছু) দ্বারা যুক্ত করলে একটি বিশেষ যন্ত্রদ্বারা (ইলেট্রকার্ডিওগ্রাম) লেডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ লিপিবদ্ধ করা যায়। ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাম হৃৎপেশীর উপর অভিঘাতের গতি (উত্তেজনার তরঙ্গ) লিপিবদ্ধ করে।

চিত্র-10 থেকে দেখা যায় যে হৃৎপিন্ড স্পন্দন থেকে স্পন্দনান্তরে কিভাবে এবং কত নিয়মিতভাবে কাজ করে; কতটা ছন্দবদ্ধভাবে সঙ্কুচিত হয়, কত যথাযথভাবে বৈদ্যুতিক ও শব্দঘটিত প্রক্রিয়ার সন্নিপাত ঘটে। এক কথায়, এতে একটি সুস্থ হৃৎপিন্ডের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বোঝা যায়।

ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাফের পরীক্ষা দ্বারা অত্যন্ত সঠিক ও স্পষ্টভাবে হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপের ছন্দ লিপিবদ্ধ করাই শুধু নয়, উপরন্তু বক্ররেখা দ্বারা হৃৎপেশীর অবস্থা, পুরো হৃৎপিন্ডের অবস্থান, এটির অক্ষের দিকও বিচার করা যায়। সুস্থ ও অসুস্থ হৃৎপিন্ডের মধ্যে সংঘটিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাম চিকিৎসকদের বিশেষ সহায়তা যোগায়।

ইলেকট্রকার্ডিওগ্রামের যুগপৎ পরীক্ষা দ্বারা হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপের মুহূর্তগুলি (অলিন্দ ও নিলয়ের সঙ্কোচন, হৃৎসঙ্কোচন ও হৃৎপ্রসারণ)

যার সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের শব্দাবলীর (মর্মর সহ) সন্নিপাত ঘটে, তা নির্ণয় করা যায়।

আজকাল পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি চালু হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যালিষ্টকার্ডিওগ্রাফির সাহায্যে হৃৎসঙ্কোচনের দ্বারা রক্তনালীতে ও মহাধমনীর প্রাচীরে হৃৎপিণ্ড থেকে সজোরে নির্গত রক্ততরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট অভিঘাত দেহে যে-কম্পন সৃষ্টি করে তা লিপিবদ্ধ করা যায়। এই কম্পনগুলি বস্তুত, খুবই অকিঞ্চিৎকর এবং কেবল বিশেষ ও অত্যন্ত সংবেদী যন্ত্রের সাহায্যেই নির্ধার্য।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্র পরীক্ষার জন্য ধমনীর রক্তচাপও মাপা হয়। নাড়ি দেখার সময় নাড়ি থামানোর জন্য বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করতে হয়, কনুইয়ের শিরার উপর দেয়া চাপ থেকেই তা বোঝা যায়। এতদ্দ্বারা ধমনীর রক্তচাপের মোটামুটি একটা ধারণা মেলে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র দ্বারা আরও নির্ভুলভাবে নাড়ি-স্পন্দন মাপা যায়।

রুশ চিকিৎসক ন. করৎকভের পদ্ধতি এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এতে কনুইয়ের উপরের দিকে রাবারের ফাঁপা ব্যাগের সাথে যুক্ত একটা চুড়ি লাগান হয়। এই ব্যাগের সাথে যুক্ত থাকে পারদের (বা অন্য কিছুর) চাপমান যন্ত্র ও চুড়ির ভিতর বাতাস পাম্প করে ঢোকানোর একটা বেলুন। হাতের ধমনীর শব্দ শোনার জন্য কনুইয়ের বাঁকের কাছে স্টেথিস্কোপ লাগান হয়। কনুইয়ের ধমনীর স্পন্দন না থামা ও হাতের ধমনীর শব্দ স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাগের ভিতর বাতাস পাম্প করা চলে। তারপর ধমনীর উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য চুড়ি থেকে বাতাস ধীরে ধীরে বের করে দেওয়া হয়। শব্দ ফিরে আসার মুহূর্তেই সর্বোচ্চ চাপ পরিলক্ষিত হয়।

চুড়ি থেকে ক্রমান্বয়ে বাতাস বের করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ থেমে যায় ও সর্বনিম্ন চাপ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে 120 — 140 মি. মি. পারদস্তম্ভ হল সর্বোচ্চ এবং 60 — 90 মি. মি. সর্বনিম্ন রক্তচাপ। বিভিন্ন অবস্থায় ধমনীর রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

বহুক্ষেত্রে রক্তপ্রবাহের মাত্রা নির্ধারণ থেকে রক্তসঞ্চালনের অবস্থা বিচার করা যায়। অসুস্থ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে সুস্থ হৃৎপিণ্ডে রক্ত দ্রুততর

বেগে সঞ্চালিত হয়। এক বাহুর শিরা থেকে অন্য বাহুর শিরায় রক্ত যাওয়ার সময়টুকু জানার এবং তা পরিমাপের নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। তেজষ্ক্রিয় আইসোটপ* (তেজষ্ক্রিয় সন্ধানী) ব্যবহারের মাধ্যমেই এক্ষেত্রে নির্ভুলতম তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

হৃৎগহ্বরগুলির রক্তচাপ পরিমাপ ও জন্মগত হৃৎরোগ (অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী পর্দা সঠিকভাবে বন্ধ না হওয়ায়) নির্ণয়ের জন্য একটি রবারের নল (ক্যাথিটার) অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থিগত শিরার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয়। মধ্যকার পর্দা উন্মুক্ত থাকলে এই নল দক্ষিণ অলিন্দ থেকে বাম অলিন্দে অথবা দক্ষিণ নিলয় থেকে বাম নিলয়ে ঢুকে যেতে পারে, যা এক্সরে পরীক্ষা থেকে সহজেই সনাক্ত করা যায়।

নীলায়ন সহ জন্মগত হৃৎরোগে কোথায় ধামনিক রক্ত এবং শিরাগত রক্তের অস্বাভাবিক মিশ্রন ঘটেছে তা জানা প্রয়োজন। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কক্ষ থেকে নেওয়া রক্তে যতটুকু অক্সিজেন আছে তার বিশ্লেষণ থেকেই এটা জানা সম্ভব।

হৃৎপিণ্ডে ক্যাথিটার ঢুকিয়ে পাওয়া তথ্যের সাহায্যে (বিশেষ সূত্র অবলম্বনে) মিট্রেল কপাটিকার ছিদ্র কুঞ্চনের পরিমাণ মোটামুটি নির্ভুলভাবে জানা যায়। ব্যাপকতম হৃৎরোগ — বাম নিলয়-অলিন্দের ছিদ্র ছোট হয়ে যাওয়ার (মিট্রেল স্টেনোসিস) ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের জন্য এই তথ্যগুলি খুবই প্রয়োজনীয়।

কৈশিকাগুলি কতটা ভঙ্গুর ও ভেদ্য এবং কত সহজে কৈশিকার প্রাচীর রক্তের উপাদানগুলির চলাচলের পথ করে দেয়, কোন কোন সময় তাও জানা প্রয়োজন হয়। বাহুর উপর একটি চিমটি কাটলে বা টুর্নিকেট বসালে রক্তপাতপ্রবণ ব্যক্তির চামড়া থেকে বিন্দু বিন্দু রক্তপাত ঘটবে।

এইসমস্ত এবং আরও বহু পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকদের সুস্থ বা অসুস্থ উভয় ব্যক্তিরই হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের জটিল কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা দেয়।

---

* তেজষ্ক্রিয় আইসোটপগুলি হল কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন প্রাকৃতিক রাসায়নিক মৌলের রকমফের। অভিন্ন গুণধর হওয়া সত্ত্বেও এগুলি দ্রুত অবক্ষয়িত হয়ে থাকে। অবক্ষয়ের সময় এগুলি থেকে তেজষ্ক্রিয় প্রবাহ নির্গত হয়। এই নির্গমন থেকেই জীবদেহে তেজষ্ক্রিয় আইসোটপের অস্তিত্ব সনাক্ত করা যায়।

অবশ্য উল্লেখ্য এই যে, হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার আধুনিক জটিল যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি যতই আধুনিক হোক না কেন সেগুলি রোগীর কাছ থেকে রোগের প্রথমাবস্থার খবর সংগ্রহের চাক্ষুষ পরীক্ষা, হৃৎস্পন্দন, অঙ্গুলাঘাত ও স্টেথিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষার মতন সাধারণ পদ্ধতিগুলির তাৎপর্য অকিঞ্চিৎকর করে দেবে না। এই পদ্ধতিগুলি হৃৎরোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আসলে প্রধান দিশারী ছিল ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্র ও সারা শরীর কিসে সবল থাকে

আমরা জানি যে, বৃদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক অনেক কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে ও অল্প পথ দৌড়লেই না হাঁপিয়ে পারে না। কিন্তু আমরা এও জানি, পর্বতারোহীরা খাড়া চড়াই বেয়ে ওঠে, দৌড়বাজরা অনেক দূরত্ব (কয়েক কিলোমিটার) দ্রুত দৌড়ে পার হয় এবং অনেক যুবক ও বৃদ্ধ উভয়ই কায়িক পরিশ্রম করে। এটা প্রথমত মাংসপেশী, ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতির মাত্রার উপর নির্ভরশীল। হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের অবস্থা, এর সহিষ্ণুতা, অধিকতর চাপের সঙ্গে দ্রুত ও কার্যকর সমন্বয় সাধনের সামর্থ্য এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পুরো দেহকে বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করার দুটি উপায় আছে।

একটি পথ হল মানুষের পরিবেশকে স্বাস্থ্যপ্রদ করা, তার জীবন ও কাজের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আবহ সৃষ্টি করা। প্রত্যেকেই জানে যে আলোকিত, শুষ্ক, ভালভাবে উত্তপ্ত ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাসম্পন্ন বসতবাড়ি ও কারখানার দালান, উপযুক্ত ও উন্নত মানের খাবার, ছোঁয়াচে রোগদমন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবর্ধক ও স্বাস্থ্যসম্মত উপাদানগুলি স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

অন্যতর উপায় হল বাহ্যিক পরিবেশের নানা প্রবাহের সঙ্গে, উদাহরণস্বরূপ, আবহাওয়ার মরশুমী বৈশিষ্ট্য (ঠাণ্ডা, গরম, বাতাস, আর্দ্রতা) এবং জীবন যাপন ও কাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য শরীরের ক্ষমতাবৃদ্ধি। এগুলি প্রধানত শরীরকে শক্তিশালী করার, শরীরচর্চা ও সঠিক নিয়মিত জীবনযাপনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়।

অবশ্য লক্ষণীয়, এই দুটি পথই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পরবর্তীতে আমরা স্বাস্থ্যরক্ষার মূল চাহিদাগুলির কথা বলব, হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে ও পুরো দেহকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে যেগুলির ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু তথাকথিত যুক্তিসঙ্গত খাদ্য, যা হল শরীর শক্ত করে গড়ে তোলা, পরিশ্রম ও বিশ্রামের যথাযথ চক্রাবর্তন সহ প্রফুল্লতা, সুস্বাস্থ্য এবং মানুষের জটিল দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক সঞ্জীবনীশক্তি রক্ষার অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত।

শৈশব থেকে শুরু করে প্রত্যেক বয়সের লোকেদের বয়সানুসারে নিজস্ব খাদ্যরীতি আছে। 40—45 বছর বয়সী ও আরও বেশি বয়সীদের জন্য এই নিয়মগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই নিয়মগুলি মেনে চলার জন্য প্রথমেই এই সমস্ত নিয়ম সম্পর্কে যথাযথ জানা প্রয়োজন। তাই এই অধ্যায়ে খাদ্যরীতিও আলোচিত হবে, যা অনেকগুলি রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য খুবই জরুরি।

অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর মতো আমাদের দেহেও দুইটি বিপরীতধর্মী অথচ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া নিরন্তর কাজ করে। এটা হল সহজতর যৌগিক পদার্থকে রাসায়নিকভাবে জটিলতর পদার্থে (সংশ্লেষণ) এবং জটিলতর পদার্থকে সহজতর যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি জীবন্ত পদার্থ তৈরিতে কার্যকর থাকে এবং দেহের শক্তিসঞ্চয় ঘটায়। শেষোক্তটি জীবিত পদার্থ বিভাজনের সঙ্গে যুক্ত। প্রক্রিয়াটি নিরন্তর কার্যরত থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও কোষকলার কর্মরত অবস্থায় এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং তা আনুষঙ্গিক শক্তিক্ষরণ ঘটায়।

আমাদের দেহ যেসব উপাদানে তৈরি সেগুলি নিয়ত জটিল রাসায়নিক রূপান্তরের অধীনস্থ। এই রূপান্তরকালে উৎপন্ন কিছু কিছু পদার্থ শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং তা প্রস্রাব, ঘাম, বহির্গত বায়ু ও অন্যান্য রেচনের মাধ্যমে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয় আর বিভাজিত পদার্থগুলি গৃহীত খাদ্য ও অক্সিজেন দ্বারা শরীরে পুনস্থাপিত হয়। এই প্রক্রিয়াগুলি হল বিপাক ও শক্তি বিনিময় যা ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

কতটা খাদ্য আমাদের প্রয়োজন? প্রশ্নটির উত্তর দিতে হলে প্রথমে শরীরের শক্তিক্ষয়ের পরিমাণটা জানা দরকার।

কায়িক পরিশ্রমরত নয় এমন ব্যক্তির দৈনিক শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ হল 3000 থেকে 3200 বড় ক্যালোরি*। যারা যন্ত্রীকৃত দৈহিক শ্রম করে তারা প্রত্যেকে প্রায় 3500 ক্যালরি এবং কঠোর কায়িক শ্রমরতরা প্রতিদিন 4000 বা ততোধিক বড় ক্যালরি ব্যয় করে। দৈনিক গৃহীত খাদ্যে অবশ্যই এই পরিমাণ ক্যালরি থাকা প্রয়োজন।

সব খাদ্যে যে একই রকম ক্যালরিক মূল্য** থাকে না তাও জানা উচিত। চর্বিতে সর্বাধিক ক্যালরিক মূল্য থাকে: 100 গ্রাম ভেষজ তেল বা সিদ্ধ মাখনে 880 বড় ক্যালরি থাকে। একই ওজনের চর্বিহীন গোমাংসে (হাড় ছাড়া) থাকে 165 ক্যালরি, চিনিতে 405 ক্যালরি, খাদ্যশষ্য ও ম্যাকারনিতে 310 — 335 ক্যালরি, রুটিতে 190 — 230 ক্যালরি, আলুতে ও বাঁধাকপিতে 20 বড় ক্যালরি।

প্রচুর ক্যালরিযুক্ত খাদ্য শরীরকে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। কিন্তু এটাই সব নয়। শুধু শক্তির উৎস হিসাবেই নয়, দেহের মধ্যে অবিরাম যে-জীবন্ত পদার্থ অবক্ষয়িত হচ্ছে সেগুলি প্রতিস্থাপনের জন্য কোষ ও কোষকলার জীবন্ত পদার্থগুলি নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়।

আমাদের দেহে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে লক্ষ লক্ষ কোষ ভাঙছে, নতুন কোষ এদের জায়গা পূরণ করছে। এইগুলি হল প্রধানত রক্তকোষ — লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা। কোষের বেশির ভাগই, বড়জোর কয়েক বছর বেঁচে থাকে; কিন্তু প্রায়শই কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহ। অর্থাৎ মূল জীবের তুলনায় এগুলির পরমায়ু খুবই সংক্ষিপ্ত। মনুষ্যদেহের অর্দ্ধেক প্রোটিন পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে নবায়িত হয়। অতএব খাদ্যে আমাদের দেহগঠনকারী পদার্থগুলি থাকা অত্যাবশ্যকীয় বটে: প্রোটিন, চর্বি, শর্করা, খনিজ লবন, ভিটামিন ও জল।

---

* শরীরে উৎপন্ন সব ধরনের শক্তিই শেষাবধি প্রধানত তাপে রূপান্তরিত হয়। এই তাপ মাপার একক হল ক্যালরি বা বড় ক্যালরি, কিম্বা কিলোক্যালরি: অর্থাৎ কিলোগ্রাম জলকে 1°C পর্যন্ত গরম করতে যতটুকু তাপ লাগে।

** একটি খাদ্যের ক্যালরিক মূল্য হল জীবের শরীরে তা যতটুকু বড় ক্যালরি উৎপন্ন করে।

পাচক রসের প্রভাবে খাদ্য-প্রোটিন অন্ত্রে অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় এবং অতঃপর প্রত্যঙ্গবিশেষের উপযোগী প্রোটিনে পুনরায় এগুলির রূপান্তর ঘটে। খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন থাকা অত্যাবশ্যকীয়, কারণ প্রোটিন কেবল পাওয়া যেতে পারে খাদ্য-প্রোটিনের উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে এবং চর্বি তৈরি হয় প্রোটিন ও শর্করা থেকে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন পাওয়া যায় প্রাণিজ খাদ্য — মাছ, মাংস, দুধ, দই, পনির, ডিম ও মাছের ডিম থেকে। প্রোটিনসমৃদ্ধ উদ্ভিদজাত খাদ্যের মধ্যে উল্লেখ্য — শিমগোত্রীয় গাছ (মটরশুঁটি, সোয়াবীন ও সীম)। রুটি ও শস্যে কম প্রোটিন থাকে।

মানসিক কাজে নিযুক্ত অথবা অল্প শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য প্রত্যহ 100 গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন।

প্রাণিজ প্রোটিন অন্য যে কোন পুষ্টিকর পদার্থের চেয়ে কেন্দ্রীয় ও স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা বাড়িয়ে হৃৎপিণ্ডে ও রক্তনালীর কাজে তীব্রতা আনে। প্রচুর পরিমাণে মাংসভোজনে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অধিক প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ ক্ষতিকর হতে পারে। ফ. ইনোজেমৎসেভ ও আ. অস্ত্রউমভ, এই দুজন রুশ চিকিৎসকের মতে স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজক মাংসের বদলে দুধ ও নিরামিশ আহার স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত রাখে এবং নিদ্রার উন্নতি ঘটায়, যা হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এর অর্থ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেওয়া নয়। কেননা, একটি সুষম খাদ্যপ্রণালীই শুধু শরীরের সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে। উপরন্তু এই পদার্থগুলি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণীয় (নিচে দ্রষ্টব্য)।

চর্বি হল শক্তির একটি মূল্যবান উৎস। এক গ্রাম চর্বি থেকে 9.3 বড় ক্যালরি উৎপন্ন হয়, কিন্তু সমপরিমাণ প্রোটিন বা শর্করার ক্যালরিক মান 4.1। কোষ তৈরিতেও চর্বি প্রয়োজনীয়।

দুধের চর্বি, মাখন এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য বিশেষভাবে স্বাস্থ্যপ্রদ। কেননা এতে দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন A আছে। শুকর, গরু ও ভেড়ার চর্বিতে এবং উদ্ভিজ্জ তেলে কোন A ভিটামিন নেই। কিন্তু এটা প্রমাণিত যে উদ্ভিজ্জ তেলে বিদ্যমান তথাকথিত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও অন্যান্য কিছু পদার্থ (ভিটামিন ইত্যাদি) বিপাকক্রিয়ার জন্য বিশেষ উপকারী আর পশুচর্বি এবং উদ্ভিজ্জ তেল উভয়ই ব্যবহার করা উচিত। উদ্ভিজ্জ তেল বিশেষভাবে বয়স্কদের জন্য অনুমোদিত, কারণ প্রাণিজ

চর্বিতে বেশি কোলেস্টারাল থাকে এবং তার আধিক্য শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর (ধমনীকাঠিন্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কোলেস্টারাল সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন ডিমের কুসুম, মাছের ডিম, পশুর যকৃৎ, মগজ, কিডনী, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, চকোলেট, কোকো, চর্বিযুক্ত মাছ খাওয়া কমাতে বা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে বয়স্ক ব্যক্তিদের পরামর্শ দেয়া হয়। নিশ্চিতই বলা যায় যে, ওই খাদ্যের ব্যবহার অবশ্যই কমাতে হবে তবে খাদ্যতালিকা থেকে একেবারে বাদ দেয়া চলবে না। উদাহরনস্বরূপ, ডিম সপ্তাহে 4-5 বার (একবারে একটা) খেলে শরীরের উপর কোন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ডিমের কুসুমে যথেষ্ট কোলেস্টারাল থাকলেও (সর্বোচ্চ 200 মিলিগ্রাম) এতে শতকরা 11 ভাগ লেসিথিন থাকে আর তা রক্তনালীর প্রাচীবের উপর কলেস্টারাল জমতে দেয় না। মেথিনিও অভিন্ন গুণসম্পন্ন এবং তা আছে দইতে। একই ধরনের কলাইন নামের পদার্থটি পাওয়া যায় চর্বিহীন গোমাংসে, ভেড়ার মাংসে ও শুকরমাংসে।

পরিপাকক্রিয়ায় শর্করা খাদ্য (চিনি ও স্টার্চ) গ্লুকোজে (চিনির সরল ধরন) রূপান্তরিত হয়ে রক্তে মিশে যায় এবং প্রাণী তা শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে ব্যবহার করে।

বিশুদ্ধ চিনিই শুধু আমরা গ্রহণ করি না। মধু, দুধ ও কেক ইত্যাদিতেও প্রচুর চিনি থাকে। আমরা বেশির ভাগ স্টার্চ পাই রুটি, শস্য, শ্বেতসারপূর্ণ খাদ্য ও ডাল থেকে। যে কোন সবজির তুলনায় আলু অনেক বেশি স্টার্চসমৃদ্ধ। জানা উচিত, বিভিন্ন চিনির বিশেষত গ্লুকোজের তুলনায় স্টার্চের মূল্য অনেক কম। উপরন্তু স্টার্চ জলে অদ্রবনীয় এবং তা শরীরে আত্তীকৃত হয় অনেক ধীরে।

শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শর্করা খেলে তার উদ্বৃত্ত অংশ প্রধানত চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। এজন্য শষ্যজাত দ্রব্য ও মিষ্টি বেশি খেলে এবং বিশেষত কোন কায়িক পরিশ্রম না করলে শরীরের ওজন বাড়ে ও হৃৎপিন্ডের কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

চিনি এবং স্টার্চ ছাড়াও খাদ্যে আরেকটি শ্বেতসার থাকে। এটি সেলুলুজ। পদার্থটি শরীরে কমই আত্তীভূত হয়। এটির সামান্য পরিমাণ স্বাস্থ্যপ্রদ, কারণ তা অন্ত্রের চলাচল বাড়ায় ও এভাবে

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। আটার রুটি, তরিতরকারী, ফল ও বেরিজাতীয় ফলে প্রচুর সেলুলুজ থাকে।

শরীরে বিদ্যমান খনিজ লবণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জলে দ্রবীভূত এই লবণগুলি বিভিন্ন কোষকলা এবং প্রত্যঙ্গকে সবিশেষ প্রভাবিত করে। খনিজ লবণের একাংশ ক্রমাগত শরীর থেকে ক্ষরিত হওয়ায় অবশ্যই এগুলি খাদ্যের মাধ্যমে পরিপূরিত হওয়া উচিত।

সুষম খাদ্যে শরীরের পক্ষে যথেষ্ট খনিজ লবণ থাকে। এতে সাধারণ লবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ব্যবস্থা না থাকায় অবশ্যই তা খাদ্যে মেশাতে হবে।

সাধারণত দিনে 10-12 গ্রাম সাধারণ লবণ আমাদের প্রয়োজন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবাধে ঘাম বেরনোর প্রেক্ষিতে শরীর থেকে বেশি সাধারণ লবণ বেরিয়ে যায় এবং সেজন্য সেখানে খাদ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণে এই লবণ অবশ্যই গ্রহণীয়।

অতিরিক্ত সাধারণ লবণ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং এজন্য শোথ দেখা দিতে পারে।

খাদ্যে বিদ্যমান অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম স্নায়ুতন্ত্র ও হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ভেগাস ও অনুবেদী স্নায়ুর মতোই পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম হৃৎপিন্ডের উপর পরস্পরবিরোধীভাবে কাজ করে। ভেগাস স্নায়ুর মতো পটাসিয়াম হৃৎপিন্ডের স্পন্দনমাত্রা কমিয়ে দেয় আর ক্যালসিয়াম অনুবেদী স্নায়ুর মতো হৃৎপিন্ডের স্পন্দন দ্রুততর করে। অধিকন্তু স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য ফসফরাসের মতো ক্যালসিয়ামও প্রয়োজনীয়। পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম উভয়েই মূত্রাধিক্য ঘটায়, অর্থাৎ মূত্রত্যাগ বাড়িয়ে দেয়। ম্যাগনেসিয়াম কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা কমায়।

কোন খাদ্যে এই খনিজ পদার্থগুলি আছে? সহজে আত্তীকরণযোগ্য ফসফরাস যৌগ রয়েছে দুধ, দই ও পনিরে। ফল, শাকসবজি বিশেষত শুকনো এপ্রিকট খেজুর, শিম জাতীয় তরকারি, পালংশাক, কালো কিশমিশ, পিচ, শালগম, কলা, মূলা, লাউ ও আলুতে প্রচুর পটাশিয়াম

লবণ আছে। প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম লবণ আছে আটা, ব্যার্লি, বাক-হ্বইট ও বাদামে, ফলে ও শাকসবজিতে এগ্বলির মাত্রা অনেকটা কম।

স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়া, স্বস্বাস্থ্য ও অধিকতর সহিষ্ণুতার জন্য আমাদের প্রয়োজন ভিটামিন। সেজন্যে আমাদের খাদ্য সর্বদাই ভিটামিনসমৃদ্ধ হওয়া উচিত। ভিটামিনগ্বলি সর্বদাই লাতিন অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকে: A, B_1, B_2, B_6, B_{12}, C, D, E ইত্যাদি। এগ্বলির প্রত্যেকটির এমনকিছ্ব অন্তর্নিহিত গ্বণ আছে যা তার একান্তই নিজস্ব।

ভিটামিন A সঠিক দৃষ্টিশক্তির (বিশেষত সন্ধ্যায়) নিশ্চয়তা দেয়, কোষকলার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে, চামড়ার উপরের আবরণ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে শক্ত করতে সহায়তা যোগায় এবং ফলত ব্রঙ্কাইটিস ও ফোঁড়া প্রতিরোধ করে। কডলিভার তেল, মাখন, মিষ্টি ও টক ননী, ডিমের কুস্বমে ও প্রাণীর যকৃতে প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন আছে। লাল গাজর, টমেটো, এপ্রিকট, সব্বজ মটরশ্বঁটি এবং তাজা সব্বজে জিনিসে বিদ্যমান কেরোটিন দেহমধ্যে A ভিটামিনে র্পান্তরিত হতে পারে।

স্নায়্ব ও রক্তবাহতন্ত্রের যথাযথ কর্মক্ষমতার জন্য ভিটামিন B_1 প্রয়োজনীয়। আটার র্বটি, বাক হ্বইট, ওট, যকৃৎ, মাংস, হৃৎপিন্ড, কিডনী, বিশেষত ইস্টে প্রচুর ভিটামিন B_1 পাওয়া যায়।

ভিটামিন C অথবা অ্যাসকর্বিক এসিড অন্যান্য ভিটামিনের মতো শরীরের স্বাভাবিক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। এতে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এই ভিটামিনের অভাবে কৈশিকাগ্বলি ভঙ্গ্বর হয়ে পড়ে। কঠোর কায়িক শ্রমে, গর্ভাবস্থায়, শিশ্বকে স্তন্যদানের সময়, অনেক ধরনের জ্বরে এবং হৃৎপিন্ডের কাজের বিশৃঙ্খলায় C ভিটামিনের প্রয়োজন খ্বই বেড়ে যায়।

আল্ব, বাঁধাকপি, ম্বলা ও বিশেষত টমেটো ও সব্বজ জিনিসে ভিটামিন C পাওয়া যায়। ভিটামিন C থাকে লেব্ব, কমলালেব্ব, মোসম্বি, ব্বনো ও বাগানের স্ট্রবেরি, র‍্যাস্পবেরি, গ্বজবেরি, কালো কিশমিশ ও মিষ্টি ব্রায়ার ও কোন কোন (বিশেষত টক) আপেলে।

শীতকালে তাজা সব্বজ শাকসবজি, বেরি ও ফল না পাওয়া গেলে মিষ্টি ব্রায়ারের রস C ভিটামিনের চমৎকার উৎস হতে পারে। গ্বঁড়া, পিল, ক্যাপস্বলে ইত্যাদির আকারে C ভিটামিন সহজলভ্য। C ভিটামিন গ্রহণ বিশেষত শীতকালে ও বসন্তকালে (গিলে বা পেশীতে ইন্‌জেকশন

নিয়ে) খুবই উপকারী। সবিশেষ উল্লেখ্য যে, প্রাকৃতিক ভিটামিনই দেহের জন্য বেশি উপকারী।

দেহের ওজনের 70 ভাগই জল যা দেহমধ্যে সংঘটিত জটিল রাসায়নিক পরিবর্তন অর্থাৎ স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার (৪২ পৃ. দ্রষ্টব্য) জন্য অপরিহার্য। বিপাকজাত যা কিছু দেহের পক্ষে ক্ষতিকর তার বেশির ভাগই জলে দ্রবীভূত অবস্থায় (ঘাম ও মূত্রে) নিষ্কাশিত হয়। শরীরের তাপমাত্রা স্থির রাখার জন্য জল বিশেষ ভূমিকাসীন। শরীরের উপর থেকে ঘামের অধিকতর বাষ্পীভবন দ্রুত তাপমুক্তি ঘটায় ও শরীরে অত্যধিক তাপসঞ্চয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

তরল খাদ্য সহ প্রতিদিন গড়ে প্রায় 1.5 লিটার জল পান করা উচিত।

কম ও বেশি তরল পদার্থ গ্রহণ উভয়ই সমান ক্ষতিকর। বেশি মাত্রায় তরল পদার্থ গ্রহণ হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে। বিশেষত অত্যধিক চা ও কফি পান ক্ষতিকর। কারণ এগুলিতে বিদ্যমান ক্যাফেইন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। এইসব পানীয়ের অপব্যবহারের জন্য নিদ্রাহীনতা ও বুকধড়ফড়ানি ঘটা সম্ভব।

সব বয়সের জন্য, বিশেষত মধ্যবয়স্ক ও বয়স্কদের জন্য কোন কোন খাবার পুষ্টিকর?

প্রথমত ও প্রধানত, টাটকা দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য। দুগ্ধ ব্যতীত মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানে ভরপুর অন্য কোন খাদ্য প্রায় নেই বললেই চলে। অধিক ক্যালরির প্রোটিন, চর্বি, ল্যাকটোস (দুধের চিনি), প্রায় সমস্ত জ্ঞাত ভিটামিন (যদিও অল্প পরিমাণে), খনিজ লবণ সবই দুধে বিদ্যমান। দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলি সম্পর্কেও কথাটি প্রযোজ্য। দই, ঘোল, কিউমিস এবং সব রকমের টক দুধ সবিশেষ পুষ্টিকর।

চর্বিযুক্ত দধিতে 12% প্রোটিন, প্রায় 18% চর্বি, ক্যালসিয়াম লবণ, ফসফরাস যৌগ ও মিথিওনিন থাকে। বিভিন্ন প্রকারের পনিরের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

সোভিয়েত বিজ্ঞান একাদমির পুষ্টিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের সুপারিশ অনুযায়ী সকল পূর্ণবয়স্কদের প্রাত্যহিক খাদ্যে নিম্নলিখিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: 500 গ্রাম টাটকা অথবা টক দুধ, 20 গ্রাম পনির, 20 গ্রাম টক ননী এবং 50-100 গ্রাম দৈ। 40-50 বছর

অথবা বয়স্কতর লোকদের ও বিশেষভাবে ধমনীকাঠিন্যের রোগীদের জন্য এগুলি প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।
দুর্ভাগ্যবশত পেটফাঁপাজনিত অজীর্ণ রোগে — অগ্নিমান্দ্য, পেটফাঁপা ও কখন কখন অতিসারে — যারা ভোগে তাদের দুধ ও টক দুধ সহ্য হয় না। তারা পাতলা ননী খেতে পারেন, যা এইসব নেতিবাচক ধর্ম থেকে মুক্ত।

লক্ষ্যণীয় যে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়মিত গ্রহণের মূল্য ও পুষ্টিকারিতা হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগীরাও সব সময় বোঝে না, আর যারা এই রোগাক্রমণের সম্ভাবনা কিছুটা এড়াতে পারে তাদের কথা নাই-বা উল্লেখ করলাম। এর কারণ: তারা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যে অভ্যস্ত নয় ও উপরোক্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ।

খাদ্যে শাকসবজি, সবুজ জিনিস, বেরি ও ফলের রক্ষামূলক (বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের পক্ষে) ভূমিকার গুরুত্ব একই ভাবে অস্বীকার করা হয়। শিম জাতীয় বীজ, বাদাম, আঙ্গুর ও কলা ছাড়া এদের সকলেরই ক্যালরিগত মূল্য কম। কিন্তু বিপাকক্রিয়ায় এগুলির মূল্য খুবই বেশি। এগুলিই তো খনিজ লবণ, ভিটামিন, বিশেষত ধমনীকাঠিন্যের প্রতিষেধক ও নিরোধক হিসাবে অতিগুরুত্বপূর্ণ C ভিটামিনের প্রধান উৎস। তাজা টমাটো C ভিটামিনসমৃদ্ধ এবং টমাটোর রসে তা কিছুটা কম থাকে। সর্বশেষ তথ্যানুসারে বয়স্করা এগুলি খাওয়া কমিয়ে দেবে না যদি না তাদের বিশেষ রোগলক্ষণ (লিভারের বা পাকস্থলী-অন্ত্রের রোগ) দেখা দেয়। ধমনীকাঠিন্যের সহযোগী ভিটামিন D ফল ও তরিতরকারিতে থাকে না। শাকসবজি পাকস্থলীতে পাচকরসের ক্ষরণ বাড়ায় ও ফলত প্রোটিনের হজম বৃদ্ধি পায়।

বেশির ভাগ লোকই প্রধানত আলু, বাঁধাকপি ও অপেক্ষাকৃত কম গাজর খেয়ে থাকে। স্পষ্টতই এটা অপর্যাপ্ত। সারা বছরই খাওয়া উচিত বীট, ভুট্টা, মটরশুটি, শিম ও অন্যান্য শিমজাতীয় সামগ্রী। লাল বাঁধাকপি, সাধারণ বাঁধাকপি কুমড়ো, লাউ, মুলো, শালগম, সুইডেনের শালগম ইত্যাদি মরশুমি সবজিও প্রয়োজনমত খাওয়া হয় না। স্যালাডের ধরনে তাজা তরকারি খাওয়া খুব উপকারী এবং তা নানা ধরনের সবুজের (মরশুমি ধরনের সেলেরি পার্সলি, চিকোরি ও বিশেষত লেটুস খাদ্যতালিকায় থাকা উচিত) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বেরি ফলের মধ্যে স্ট্রবেরী, বাগানের ও বন্য

চেরী এবং কালো কিশমিশ (এগুলি চিনিতে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়) সবচেয়ে উপকারী এবং সারা বছর এগুলি খাওয়া উচিত।

ফলও পুষ্টিকর, বিশেষত শীতকালীন কোন কোন আপেল পাকস্থলীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে, ফলত বিপাকক্রিয়ার জন্য ভাল। আঙ্গুর, লেবুজাতীয় ফল, খেজুর ও ডালিম অত্যন্ত উপকারী। আলু এবং কোন কোন সবজি, বিশেষত বাঁধাকপিতে অঢেল সেলুলজ (যে শর্করা দিয়ে অধিকাংশ উদ্ভিদের কাঠামো ও কোষ গঠিত) থাকায় কোন কোন লোকের পেটফাঁপাজনিত অজীর্ণ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়, যা কেবল হজমেই নয়, হৃৎপিণ্ডের কাজেও বিঘ্ন ঘটায়। পাকস্থলীতে উৎপন্ন গ্যাস মধ্যচ্ছদাকে উপরে ঠেলে তোলে এবং হৃৎপিণ্ড অর্ধশয়ান অবস্থান নেয়; যা খুবই ব্যতিক্রমী ও হৃৎপিণ্ডের কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক। এমতাবস্থায় এইসব খাবার পুরোপুরি বাদ দিতে হবে অথবা ভালভাবে রান্না করে, যেমন আলুমাখা, বাঁধাকপির মণ্ড, বাঁধাকপি ও আলুর কাটলেট ও ক্রোকেটস হিসাবে খাওয়াই ভাল।

যে কোন খাদ্যের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান প্রোটিন থাকে মাংসে (গরু, ভেড়া ও শূকরের মাংসে) মুরগি, ডিম ও মাছে। 100 গ্রাম ভাল গরুর মাংসে আছে 16.1 গ্রাম প্রোটিন।

চর্বিহীন মাংসই ভাল (মাংসে চর্বির পরিমাণ 5%-35%)। বয়স্কদের খাওয়া উচিত সিদ্ধ মাংস, স্টু-করা অথবা বাস্পসিদ্ধ মাংস। মাংসের রোস্ট ও ভাজাকরা মাংস খাওয়া কমিয়ে ফেলা উচিত। অধিক কলেস্টারল থাকার জন্য লিভার, কিডনি, মগজ, বাষ্পসিদ্ধ মাংস ও টিনজাত মাংসের ব্যবহারও একইভাবে সীমিত হওয়া উচিত। এগুলিতে আরও থাকে পিউরিন ক্ষার, গুণের দিক থেকে যেগুলি প্রায় ক্যাফিনের সমতুল্য। এইসব পদার্থ ধমনীকাঠিন্য ও বাত (পাদবাত) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কচি পশুর (বাছুর, ভেড়া) মাংসে পিউরিন ক্ষার বয়স্ক পশুর চেয়ে বেশি থাকে। তাই মধ্যবয়স্ক ও বৃদ্ধদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী মাংস হল চর্বিহীন গোমাংস, তবে ভেড়া ও শূকরের চর্বিহীন মাংস ও মুরগির মাংসও গ্রহণীয় বটে।

মিঠে জলের মাছ (কই, রুই ইত্যাদি) এবং সামুদ্রিক মাছ (কড, প্লেন্টচ ইত্যাদি) সহজপাচ্য। কিন্তু কথাটি বিভিন্ন প্রকারের স্টার্জন (চর্বিযুক্ত), যে কোন প্রকারের তথাকথিত লালমাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

নয়। এই সব খাদ্য অবশ্যই কমাতে হবে। পুনরায় জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে এইসব খাবার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা নয়, কমানোর কথাই বলা হচ্ছে, বিশেষত যদি এগুলি অনেকদিন থেকে খাওয়ার অভ্যাস থাকে।

পালা-অনুসারে মাছ এবং মাংস খাওয়া সুবিধাজনক। কারণ এতে দুই ধরনের পুষ্টিকর পদার্থই পাকস্থলীতে যায় এবং পরিপাকযন্ত্রের কাজে অনুরূপে সহায়তা যোগায়। মাংস জাতীয় খাদ্য ও সাধারণভাবে প্রোটিন সম্পর্কে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করলে (দেহের ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে 0.8 গ্রামের চেয়ে কম) শরীরের প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের সরবরাহ কমে যাওয়ায় দেহে প্রোটিনের অভাব দেখা দিতে পারে।

অবশ্য সবিশেষ উল্লেখ্য, 45-50 বছর বয়সোর্ধদের খাবারে যে-মাংস রক্ষামূলক (প্রতিরোধী) তা খাদ্য তালিকা থেকে বর্জন নয়, সীমিতকরণই কর্তব্য। এদের খাদ্য তালিকায় মাংস অবশ্যই প্রধান উপাদান হবে না।

শ্বেতসারীয় এবং শস্যজাত খাদ্য সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে যে রুটিতে শর্করার পরিমাণ শতকরা 40-50 ভাগ। দিনে যে পরিমাণ রুটি খাওয়া হয় তাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্যালোরি থাকে। আধা কিলোগ্রাম কাল (রাই) রুটিতে 1000 বড় ক্যালরি থাকে এবং একই পরিমাণ উন্নত মানের গমের রুটিতে 1200-এর বেশি ক্যালরি থাকে। অধিকন্তু, শরীরে চর্বি গঠন ও সঞ্চয়ের মূল উপাদান হল রুটি। অতএব রুটিভোজীদের, বিশেষত, তারা 45-50 বছরে পড়লে এবং তাদের ওজন বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে হলে প্রাত্যহিক রুটি খাওয়ার পরিমাণ 300-350 গ্রামের বেশি হবে না। কালো রুটি বেশি পুষ্টিকর। কেননা এতে আছে ভিটামিন E, ভিটামিন B-র পুরো গ্রুপ, ক্যালসিয়াম লবণ, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও প্রচুর সবজি জাতীয় সেলুলুজ। গমের রুটির মান যত উন্নত হবে তাতে এইসব উপকারী উপাদানগুলির মান ততই নিচু হবে।

সমস্ত শস্যের মধ্যে বাকহুইট ও জৈয়ের স্থান সর্বাগ্রে। এগুলিতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম থাকে, কিন্তু তাদের প্রোটিনে আছে প্রয়োজনীয় সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড, আর জৈবিকভাবে মূল্যবান ফ্যাটি-অ্যাসিডসমৃদ্ধ চর্বি। এগুলি খনিজ লবণসমৃদ্ধও। ম্যাকারনি, নুডুলস বা ভার্মিসেলী ও প্রাতারাশের শস্যের মতো শস্যজাত খাদ্যের পরিমাণ কমানো উচিত।

জ্যাম অথবা মার্মালেডের পদ্ধতিতে এবং বিশেষত চিনির মধ্যে ফল

ভাপে সিদ্ধ করে যখন খাওয়া হয় তখন চিনি অধিকতর পুষ্টিকর। মধু বিশেষ উপকারী। এতে থাকে অনেকগুলি খনিজ লবণ, ভিটামিন, কিছু হরমোন, এমনকি কিছু অ্যাণ্টিবায়োটিকস্। ভিটামিনসমৃদ্ধ মধু বিশেষ উপকারী। মধুর উপকারী গুণগুলি, বিশেষত বৃদ্ধদের জন্য পুরাকাল থেকেই পরিচিত। মধ্যযুগীয় বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা লিখেছেন, 'যৌবন অটুট রাখতে চাইলে অবশ্যই মধু পান করবে'। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টোটেলও একই মত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন মধু আয়ুবৃদ্ধির সহায়ক। প্রত্যহ চিনির পরিবর্তে 50-100 গ্রাম মধু ব্যবহার যে অনেক ভাল এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির খাদ্যতালিকা কিভাবে তৈরি করা উচিত?

উপরোক্তভাবে খাদ্য শুধু বিভিন্ন রকমেরই হবে না, এতে প্রধান পুষ্টিকর পদার্থগুলির এমন অনুপাত থাকবে যাতে খাদ্যের সুহজম ও যথাযথ বিপাকক্রিয়া নিশ্চিত হয়। মোটামুটি মানসিক ও শারীরিক কাজে নিযুক্ত একজন যুবকের খাবারে প্রোটিন, চর্বি ও শর্করার অনুপাত হওয়া উচিত 1:1:5 অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে 100 গ্রাম প্রোটিন, 100 গ্রাম চর্বি (বেশি মাখন ও কম উদ্ভিজ্জ তেল) এবং 500 গ্রাম শর্করা। এতে দৈনিক উৎপন্ন হয় 3400 বড় ক্যালোরি। 45-50 ও আরও বেশি বয়সীদের খাদ্যে এই অনুপাত হল 0.5:0.5:4 অর্থাৎ 60-80 গ্রাম প্রোটিন, 50-60 গ্রাম চর্বি (উদ্ভিজ্জ তেল বেশি, মাখন কম) এবং 400-500 গ্রাম শর্করা। এ থেকে দৈনিক উৎপন্ন হবে 2300 থেকে 3000 বড় ক্যালরি।

ক্রমাগত অনুপাতটি ভাঙ্গলে কি ঘটবে? শরীরে ওজন বৃদ্ধির প্রবণতাশীল কোন ব্যক্তির খাবারে এই অনুপাত বাড়িয়ে 150 গ্রাম প্রোটিন, 150-200 গ্রাম চর্বি (বেশির ভাগ মাখন) এবং 600-700 গ্রাম শর্করা করলেই বা কি ঘটবে? তার খাবারে শষ্যজাত দ্রব্য ও মিষ্টি বেশি থাকলে (ক্যালরির প্রাত্যহিক পরিমাণ যদি 4500, এমনকি 5500 বড় ক্যালরি হয়) অথচ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম একই থাকে তাহলে? এক্ষেত্রে দেহ যে পরিমাণ ক্যালরি খরচ করতে পারে তার চেয়ে বেশি ক্যালরি পাবে এবং ফলত শরীরের অনেক অংশে — তলপেটের চামড়ার নিচে, হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে এবং খোদ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চর্বি জমতে থাকবে। এতে মানুষের ওজন বাড়ে এবং সে মোটা হয়ে যায়। কিছুদিন

তার স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কিন্তু জায়মান মেদস্ফীতি নানা অসুবিধা, প্রধানত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। মেদবহুল হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক কার্যকলাপ চালাতে পারে না। স্থূলদেহী ব্যক্তি ঘন ঘন শ্বাস নেয়, অসুস্থ বোধ করে এবং তার কর্মশক্তি কমে যায়। অসময়ে উদ্ভূত ও দ্রুত বাড়ন্ত ধমনীকাঠিন্য, সবরকম ক্ষতিকর ফল সহ মেদবাহুল্যের অপরিহার্য সঙ্গীরূপে প্রকটিত হয়।

অত্যধিক পানাহারের কুঅভ্যাসের ফলে পাকস্থলী ফুলে যায় এবং সারাদিনে গৃহীত খাবারের একাংশ আত্তীকরণে অন্ত্রের ব্যর্থতা নৈমিত্তিক প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে।

তলপেটের চামড়ায় বেশি চর্বি জমে যাওয়ার ফলে অন্ত্রে মন্থরতা আসে। যেসব লোকের জীবনযাত্রা কর্মচঞ্চল নয় তাদের মধ্যে এটা প্রায়শই দেখা যায়। এই অবস্থা অচল কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কখন কখন পেটফাঁপা সহ অজীর্ণতা সৃষ্টি করে। এতে হৃৎপিণ্ড অর্দ্ধশয়ান ও অনুভূমিক অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং ফলত হৃৎপিণ্ডের কাজে বিঘ্ন ঘটে।

যারা ক্রমাগত অত্যধিক আহারের ক্ষতিকর পরিণাম বুঝতে পারে না, এই কুঅভ্যাস বর্জনেরও চেষ্টা করে না, হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে অবহেলা করে তারা এভাবেই নিজেদের আয়ুকালকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে ফেলে। এমনকি পুরাকালের চিকিৎসকরাও বলতেন যে হালকা-পাতলা লোকেরা মোটা লোকদের চেয়ে দীর্ঘজীবী।

মোটা হওয়ার সহায়ক উপাদান, প্রথমত অতিভোজন যত তাড়াতাড়ি বাদ দেয়া যায় ততই দ্রুত শরীরের কর্মক্ষমতা ফিরে আসে। যারা অতিভোজন এড়িয়ে চলে তাদের শরীরে ভাল লাগার বোধ অটুট থাকে, দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ওজনের সামঞ্জস্য ঘটে, হৃৎপিণ্ডের ও পাকান্ত্রিক কাজ স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং অল্পবয়সে ধমনীকাঠিন্য দেখা দেয় না।

ধমনীকাঠিন্য ও রক্তচাপাধিক্যের লক্ষণাক্রান্ত মধ্যবয়সী ও বয়স্কদের পক্ষে মেদবাহুল্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালান খুবই জরুরি।

উল্লেখযোগ্য যে সামান্য ওজনবৃদ্ধি দেহের জন্য সর্বদাই বিপজ্জনক নয়। মাহমুদ আইভাজভ 1958 সালে তার 150 জন্মবার্ষিকী পালন করেন এবং তার ওজনও কিছুটা বেশি ছিল।

শরীরে চর্বিসঞ্চয় শুধু অতিভোজন থেকেই নয়, অন্যান্য কারণেও ঘটতে পারে। এগুলির মধ্যে অন্তর্স্রাবী কোন কোন গ্রন্থির কার্যকলাপে

বিঘ্ন যেমন ডিম্বাশয় বা থাইরয়েড গ্রন্থির অপর্যাপ্ত কাজ উল্লেখ্য। সন্তানপ্রসবের পরে অনেক সময় মেয়েদের অথবা রোগমুক্তির পর (টাইফয়েড প্রভৃতি) পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মোটা হয়ে যেতে দেখা যায়।

তবে মেদবাহুল্যের সবচেয়ে বড় কারণ হল অতিভোজনের কুঅভ্যাসের সঙ্গে উশৃঙ্খল কর্মহীন জীবনযাপনের সন্নিপাত। সাধারণ মেদবাহুল্যের সঙ্গে লড়াইয়ের কিছু উপায় নিচে আলোচিত হল।

সর্বপ্রথম, শক্তিক্ষয়ের পরিমাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যের ক্যালরিগত মান কমান আবশ্যক। চর্বির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে নিম্নতম পর্যায়ে আনতে হবে। দেহের সঞ্চিত চর্বিটুকু অবশ্যই ব্যয় করা উচিত। রুটি, আলু, মিষ্টি, শস্যজাত দ্রব্য, ম্যাকারনি এবং তৃষ্ণা উদ্রেককারী মশলা ও নুনযুক্ত খাবারের ব্যবহার কমাতে হবে, যেন বেশী জল শরীরে না জমতে পারে। খাবারে দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু মিষ্টি ননী বাদ দিতে হবে ও চর্বিহীন দই খেতে হবে। ফল, শাকসবজি ও কাঁচা জিনিস ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে

পেট পুরে খাওয়ার কুঅভ্যাসমুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। সমস্ত দিনে সমান সময়ের ব্যবধানে, পাঁচ-ছবার অল্প পরিমাণে খেতে হবে।

রুটি, অ্যাঢেল ফল, শাকসবজি, বেরি, খেজুর ইত্যাদি বেছে নিতে হবে। রেচক ঔষধ প্রয়োগ, ডুস-দেওয়া, পেটে ম্যাসেজ, পরিশ্রান্ত না হয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটা ও চিকিৎসাসম্মত শরীরচর্চাও অবশ্য কর্তব্য। কখনও কখনও চিকিৎসকরা উপবাসের ব্যবস্থা দেন (10 দিনে 1 দিন)। এই সব উপবাসের দিন খেতে হবে দুঘণ্টা অন্তর অন্তর সমান ভাগে ভাগ করে 1.5-2 কিলোগ্রাম পর্যন্ত আপেল ('ফলের' দিন) অথবা 1.5 কিলোগ্রাম কাঁচা তরিতরকারি, ফল ও বেরী ('ফল ও সবজি' দিন) কিংবা 6-8 গ্লাস দুধ, অথবা বাটার মিল্ক, দৈ ইত্যাদি ('দুধ' দিন) বা 500-600 গ্রাম চর্বিশূন্য পনির ও দুই কাপ মিষ্টি চা ('দই' দিন)।

পুনরায় জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, ধারাবাহিক শরীরচর্চা, চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম, দীর্ঘ পথ হাঁটা, বরফের উপর স্কী ও স্কেটিং করা মেদবাহুল্যের প্রশমণের সহায়ক।

অতিরিক্ত স্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সময়ের প্রয়োজন। এইমাত্র উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি ক্রমান্বয়ে গ্রহণীয়। খাওয়ার ব্যাপারে সদা অসংযমী ব্যক্তি হঠাৎ করে স্বাভাবিক হতে পারে না। বেশি সময় বসে থাকতে

অভ্যস্ত লোককে অল্পসময়ে কর্মচঞ্চল করা অসম্ভব। যুক্তিযুক্ত খাদ্যাভাস ও যথাযথ জীবনযাত্রা প্রণালীর কঠোর পরিবর্তন ঘটালে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ও বিশেষত স্নায়বিক ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া (অবসন্নতা, অসুস্থতা, অত্যধিক উত্তেজনা) ঘটতে পারে। অভ্যাসকে অবশ্যই গণ্য করতে হবে।

চিকিৎসকের পরামর্শমতো ও তাঁর তত্ত্বাবধানে ধৈর্যসহকারে ও ক্রমান্বয়ে পরিচালিত ব্যবস্থাতেই বরং ঈপ্সিত ফল ফলে। বলা বাহুল্য, রোগীর নিজের আকাঙ্খা, ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্য্য অত্যাবশ্যকীয়।

স্বাভাবিক ওজন, 160 সেন্টিমিটার লম্বা যুবকদের ওজন হওয়া উচিত 60 কিলোগ্রাম। 175 সেন্টিমিটারের জন্য 65 কিলোগ্রাম, 180 সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রে আদর্শ ওজন 70 কিলোগ্রাম।

সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাদেমির পুষ্টিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের তথ্যানুযায়ী মধ্যবয়স্ক এবং বয়স্কদের দৈর্ঘ্য ও ওজনের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিছুটা ভিন্ন। তাদের মতে 40-50 বছর বয়সীদের স্বাভাবিক ওজন নির্ণয় করা হয় নিম্নরূপে: কোন ব্যক্তির উচ্চতা যত সেন্টিমিটার তার শেষের দুই অঙ্কের সঙ্গে 5 থেকে 8-এর মধ্যে যে কোন একটি সংখ্যা যোগ করলে উক্ত ব্যাক্তির ওজন কিলোগ্রামে পাওয়া যেতে পারে (যেমন দৈর্ঘ্য 165 সেন্টিমিটার হলে তার স্বাভাবিক ওজন $65+5(8)=70(73)$ কিলোগ্রাম হওয়া উচিত)।

সর্বোচ্চ স্বাভাবিক ওজনের 25% বৃদ্ধি সহনীয় মেদস্ফীতির, 50% বৃদ্ধি মেদবহুলতার গুরুতর অবস্থার লক্ষণ বলা যায়।

2-3 মাস পর পর নিজের ওজন নেওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই কাজটি ভুলে যায় এবং ওজন না নিয়েও পরিস্কার বুঝতে পারার পর্যায়ে পৌঁছলেই শুধু তারা ওজনের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ওজন স্বাভাবিক করতে ইচ্ছুক মোটা লোকদের চিকিৎসার ফলাফল বোঝার জন্য মাসে অন্তত একবার নিজের ওজন নেওয়া উচিত।

কখনও কখনও, যদিও সব সময় নয়, কিছু লোক অন্যতর চরমে পৌঁছয় এবং নিম্নরূপ অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ করে: 20-30 গ্রাম প্রোটিন, 30-40 গ্রাম চর্বি, 250-350 গ্রাম শর্করা। দিনে সর্বমোট 1400-2000 বড় ক্যালরি।

বহুল প্রচারিত ও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত একটা ধারণা আছে যে বেশি

খাওয়ার চেয়ে কোন কোন সময় ক্ষুধার্ত থাকাটা ভাল। ডাক্তারী পত্র-পত্রিকা পড়ে বা ডাক্তারী পরামর্শের ভুল ব্যাখ্যা করে কিছু লোকের একটা ভুল ধারণা জন্মায় যে মাঝে মাঝে উপোস না করে ক্রমাগত কম খাওয়াটাই ভাল। উপরোক্ত খাদ্যে স্বাভাবিক জীবনীশক্তির নিশ্চয়ক যথেষ্ট প্রোটিন থাকে না এবং এর ক্যালরিগত মূল্য ও খুবই কম। এতে মাংস প্রায় বাদ দেওয়া হয়। যারা এই ধরনের খাবার চালিয়ে যায় তাদের শরীর প্রধানত প্রোটিনের স্বল্পতার জন্য গুরুতর চাপের মধ্যে থাকে। তাদের ওজন কমতে থাকে, শরীর ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে এবং তারা তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়। পুষ্টিকর জিনিসগুলি খাদ্যতালিকায় থাকার এবং উচ্চক্যালরিসমৃদ্ধ ও বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী খাদ্যতালিকায় যুক্ত হওয়ার নিরিখেই শুধু স্বাস্থ্যের অবস্থা ও কর্মক্ষমতা পুনঃস্থাপিত হতে পারে।

খাদ্যের সুগন্ধ এবং খাওয়ার পরিবেশ স্বাভাবিক হজম ও আত্তীকরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শান্ত ও আরামদায়ক পরিবেশে সুস্বাদু খাদ্য খেলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, পাচকরসের ক্ষরণ বাড়ে এবং তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। ইভান পাভলভ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে খাওয়ার সময় সমস্ত রকমের চিন্তা ও দৈনন্দিন জীবনের উদ্বেগ এড়ান, সব রকম গুরুত্বপূর্ণ আলাপ ও কঠিন বই পড়া বাদ দেওয়া উচিত।

দিনে 3-4 বার খাদ্য গ্রহণ করা হয়। এই সময় উদ্ভূত আবেগগুলি (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) স্নায়ুতন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের কাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ঋণাত্মক আবেগগুলি কেবল ক্ষুধাই কমায় না স্নায়ুতন্ত্র ও পাকাশয়ের উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং রক্তবাহতন্ত্রের কাজেও নিয়মিত বিঘ্ন ঘটায়।

একটা নির্দিষ্ট খাদ্যবিধি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন খাবার খাওয়া উচিত এবং খাওয়ার সময়ের মধ্যে বেশি ব্যবধান না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সোভিয়েত চিকিৎসাবিজ্ঞান আকাদমির পুষ্টিবিদ্যা ইনষ্টিটিউ-টের কর্মীরা ছাত্রদের দিনে একই খাদ্য দুই, তিন, চার ও পাঁচ ভাগে ভাগ করে খাওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। দেখা গেছে দিনে 3-4 বার খাদ্য গ্রহণই সব থেকে ভাল। এভাবে খেলে খাদ্যের সুসমন্বয় ঘটে এবং ফলত ছাত্ররা দুর্বল হত কম এবং অধিকতর কর্মদক্ষতা দেখাত।

ঘুমানোর 1.5-2 ঘণ্টা আগে খাবার খাওয়া উচিত। অত্যধিক নৈশাহার

বা খাবার খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমানো শরীরের পক্ষে, বিশেষত বয়স্কদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। গভীর রাতে খেলে প্রায়ই ঘুমে অসুবিধা ঘটে। খালিপেটে ঘুমানোও খুবই খারাপ। তাই রাতের খাবার খুবই হালকা হওয়া উচিত। এক গ্লাস দুধ, দৈ কিংবা এক টুকরো রুটি, একটা আপেল অথবা বিস্কিট সহযোগে এক কাপ চা এজন্য যথেষ্ট।

কিছু লোক অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে চিনি খেয়ে থাকে (কখনো একসাথে অনেকটা চিনি ও মিষ্টি খেয়ে থাকে, আবার কখনো কয়েক ঘণ্টা কিছুই না)। এদের রক্তে চিনির মাত্রায় অস্বাভাবিক ওঠা-নামা ঘটে, শরীরে অত্যন্ত দুর্বলতা দেখা দেয় ও বুক ও পাকস্থলী অঞ্চলে ব্যথা অনুভূত হয়। কখনো এই ব্যথার পূর্বে তারা সুতীব্র ক্ষুধা অনুভব করে। নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ এবং খাদ্য গ্রহণের সময়ের মধ্যে বেশি ব্যবধান না রাখা এদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। সর্বদা এক খণ্ড চিনির টুকরা বা মিছরি হাতের কাছে রাখা ও ক্লান্ত বা দুর্বল বোধ করা মাত্র তা খাওয়া এদের পক্ষে ভাল।

শরীর মজবুত করা

সূর্যালোক, কৃত্রিম অতিবেগুনী রশ্মি এবং বিভিন্ন ধরনের তাপীয় উদ্দীপক, (ঠাণ্ডা জল ও বাতাস) শরীর মজবুত করতে ও রোগ প্রতিরোধে নির্দিষ্ট মাত্রায় বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় রৌদ্রস্নান ও বাত্যাস্নান প্রচলিত। অতিবেগুনি রশ্মি (স্ফটিক বাতি) ব্যবহৃত হয় কেবল অতিমাত্রায় কম সূর্যালোক পায় এমন লোকজন, যথা উত্তরাঞ্চলের লোকেদের ও খনিশ্রমিকদের জন্য। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যগঠনের জন্যও এই বিকিরণ ব্যবহৃত হয়। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য তা উপকারী।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাপোদ্দীপক ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয়। শরীরকে কঠিন হতে সহায়তা যোগান এবং পরিবেশগত তাপমাত্রার দ্রুত ওঠা-নামা, বিশেষত শীত সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত উপকারী।

বাহ্য পরিবেশের তাপমাত্রা ও দেহের তাপমাত্রার মধ্যে একটা ব্যতিহার আছে। কিন্তু, বাহ্য পরিবেশের তাপমাত্রা যাই হোক মনুষ্যদেহের ও

উষ্ণরক্তীদের দেহের তাপমাত্রা সর্বদাই একটি বিশেষ স্তরে রক্ষিত থাকে। একটি জটিল তাপনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা সম্ভবপর হয়, যা শরীরে তাপসৃষ্টি ও তাপক্ষয় প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

রাসায়নিক যৌগিক পদার্থকে সরল পদার্থে রূপান্তরের ফল হিসাবেই দেহের মধ্যে তাপমুক্তি ঘটে। অন্য কিছুর তুলনায় কঠোর কায়িক শ্রম এই রূপান্তরকে ত্বরিত করে এবং তাপের উৎপাদন বাড়ায়।

বাহ্য পরিবেশের তাপমাত্রাও শরীরের তাপসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। কারণ, বাহ্য পরিবেশের তাপ বৃদ্ধি পেলে বিপাকক্রিয়ার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে বাইরের তাপ কমলে বিপাকক্রিয়ায় তীব্রতারও কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে।

দেহের তাপক্ষয় অর্থাৎ পরিবেশে তাপক্ষরণ ঘটে প্রথমত, দেহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দেহের চেয়ে শীতলতর কোন বস্তুতে পরিবাহিত হয়ে এবং চামড়া থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে, দ্বিতীয়ত দেহের উপর থেকে ঘামের বাষ্পীভবনের মাধ্যমে; তৃতীয়ত, ফুসফুস থেকে জলের বাষ্পীভবনের দ্বারা অর্থাৎ জলীয় বাষ্পে রূপান্তরের মাধ্যমে, যাতে নিশ্বাসবায়ু সম্পৃক্ত থাকে।

শীতের প্রভাবে চামড়ার উপরকার রক্তনালীগুলি সঙ্কুচিত হলে তাপক্ষয় পায়। গরমের প্রভাবে এই শিরাগুলি স্ফীত হলে তাপক্ষয় বৃদ্ধি পায়। ঘর্মগ্রন্থিগুলি সক্রিয়তর হলে শরীরের উপর থেকে বেশি ঘাম বাষ্প হয়ে উড়ে যায় এবং ফলত বেশি তাপক্ষয় ঘটে। কিন্তু ঘামের বাষ্পীভবনও বাতাসের আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। বাতাসে আর্দ্রতা যত বেশি থাকবে ঘাম ততই কম হবে। এজন্যই শুষ্ক অবহাওয়ার চেয়ে সেঁতসেঁতে আবহাওয়ার গরম বেশী অসহনীয়।

শীতে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রশমিত হয় এবং গরমে বিশেষত অত্যধিক উত্তপ্ত দালানে তা বৃদ্ধি পায়। শেষোক্ত অবস্থায় রক্তসঞ্চালনের স্বল্পতাক্রান্ত রোগীরা অত্যধিক তাপজনিত শ্বাসকষ্টে বেশী কষ্ট পেয়ে থাকে।

শরীর বাতাসে বেশি ঠান্ডা হয়। পরিস্থিতিটা শীতে অসহ্য হয়ে ওঠে এবং সেই বাতাসই গরমে কি মনোরম! ঝড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে হাঁটতে হলে পেশীর বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয় যা নিবিড় তাপোৎপাদনের সঙ্গে জড়িত এবং এইসঙ্গে হৃৎরক্তসংবহনের তীব্রতর কার্যকলাপেরও অনুষঙ্গী।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল যেখানে তাপমাত্রার বিশেষ ওঠা-নামা ও ঝড়ো হাওয়া নেই সেইসব জায়গাতেই হৃৎরোগীরা সবচেয়ে ভাল থাকে।

ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিপাকক্রিয়াকে এবং ফলত তাপসৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। মস্তিষ্কে তাপনিয়ন্ত্রক একটি স্নায়ুকেন্দ্র পাওয়া গেছে। প্রাণীর মস্তিষ্কের বিশেষ অংশে উত্তেজক প্রয়োগ করলে দেহের তাপমাত্রা বাড়ে। স্বভাবতই এই স্নায়ুকেন্দ্র ত্বক থেকে অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলির মাধ্যমে আসা স্পন্দনগুলির প্রভাবাধীন। চর্মস্থ স্নায়ুর ডগাগুলি গরম বা ঠাণ্ডা দ্বারা উত্তেজিত হলে এই উত্তেজনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে তাপনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে যায় এবং সেখান থেকে বহির্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে পেশী সহ তাপ উৎপাদন ও ক্ষরণের আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রত্যঙ্গে পৌঁছয়।

ত্বকে কিংবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলিতে (শ্বসন বা খাদ্য গ্রহণের সময়) বিদ্যমান স্নায়ুর ডগাগুলি ঠাণ্ডা বা গরম দ্বারা উত্তেজিত হলে শুধু তাপনিয়ন্ত্রণই প্রভাবিত হয় না, প্রতিবর্তক্রিয়ার মাধ্যমে তা মস্তিষ্কস্থ রক্তপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রকে উত্তেজিত করে ধমনীর রক্তচাপে তারতম্য ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ঠাণ্ডা জলে পা রাখলে ক্ষুদ্র ধমনীগুলির সঙ্কোচনের ফলে ধমনীর রক্তচাপ বেড়ে যাবে। ত্বকে তাপপ্রয়োগ করলে (হাতে ও পায়ে গরম জল দেয়া) হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও কিডনীর ধমনীগুলিও প্রতিবর্তীভাবে (রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের মাধ্যমে) স্ফীত হয়ে উঠবে।

অত্যন্ত গরম জলে স্নানের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ত্বকীয় রক্তনালীগুলি স্ফীত না হয়ে সঙ্কুচিত হতে পারে। অত্যন্ত গরম জলে স্নান, ঠাণ্ডা জলে বা ঠাণ্ডা বাতাসের মতোই শীতকম্প সৃষ্টি করতে পারে। ত্বকে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করলে রক্তনালীগুলির একই সঙ্কোচন ও স্ফীতির আবর্তন দেখা যায়: ঠাণ্ডা জলে স্নানের পর কিছুক্ষণ পাংশুটে আভার পরই দেখা দেয় রক্তাভা। তাপমাত্রার তীক্ষ্ণ পরিবর্তনে ও ঠাণ্ডা জলে স্নানে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের প্রায়ই সর্দি হয়। সর্দি হল রক্তনালীগুলির অস্বাভাবিক ও আত্যন্তিক প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। নাকে, বাকযন্ত্র ও শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিস্থ রক্তনালীর এই অত্যধিক প্রতিক্রিয়া সেখানে সদাবিদ্যমান জীবাণুর বিরুদ্ধে ঝিল্লিগুলির প্রতিরোধক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলত, এই সকল জীবাণু শ্বসনতন্ত্রের

উপরের এলাকায় তথ্যকথিত সর্দি সৃষ্টি করতে পারে, যা বসন্তের শুরুতে ও শরতের শেষের দিকে তাপমাত্রার ও আর্দ্রতার ওঠা-নামার সময় বিশেষত দেখা দেয়।

বাতাস ও জলের প্রয়োগ-পদ্ধতিগুলিতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমানো ও স্থিতিকাল বাড়ানো হয়। এই প্রণালী তাপনিয়ন্ত্রণে ও রক্তসঞ্চালনে সু-প্রভাব বিস্তার করে এবং দেহকে শীতসহিষ্ণু করে তোলে। এভাবে রক্তনালীগুলি যেন শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং উপযোগী (বাড়তি নয়) রক্তসঞ্চালক প্রতিবর্ত সৃষ্টি হয়। এমনকি, পরিবেশে তাপমাত্রার উল্লেখ্য পরিবর্তনও এইসব শক্তদেহীদের শ্বাসতন্ত্রের ঊর্ধ্বাঞ্চলে বা হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কোন এলাকায় অতিরিক্ত সর্দি-উৎপাদক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

সমস্ত দেহকে মজবুতভাবে গঠন করলে শরৎ ও বসন্তে শ্বাসতন্ত্রের ঊর্ধ্বাঞ্চলে সর্দি ও টনসিল-প্রদাহ দেখা দেয় না এবং হৃৎনিষ্ক্রিয়ার প্রধান কারণ — বাতজ্বরের আক্রমণও এড়ান যায়।

শরীরচর্চা ও খেলাধুলা

আমাদের শরীরের যাবতীয় প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপে, বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কাজ আমাদের কর্মকাণ্ডের উপর অর্থাৎ আমরা কাজ করি বা করি না, বিশ্রাম করি, শুয়ে থাকি না বসে থাকি, ধীরে হাঁটি না দৌড়াই ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

মানুষ অনুভূমিক অবস্থানে বিশ্রামের জন্য (বিশেষত ঘুমের সময়) যখন শুয়ে থাকে তার বিপাকক্রিয়া তখন যথেষ্ট কমে যায় এবং ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপে ভেগাসের প্রাধান্য থাকে তার হৃৎপিণ্ড তখন ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয় (মিনিটে 60 বার), শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে যায় (বগলে 36.2°C—35.5°C)। অনুভূমিক অবস্থান থেকে খাড়া অবস্থায় অবস্থান বদলালে অনুবেদী স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই স্নায়ুগুলি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ত্বরান্বিত করে (মিনিটে 72—75 বার) আর বিপাকক্রিয়ারও কিছুটা উন্নতি ঘটে। এই সময়ে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে 37°C পর্যন্ত পৌঁছয়।

যেকোন কায়িক শ্রমের সময় বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর হয় এবং দেহের তাপ কোন কোন সময় 37.5°C বা আরও বেশী বেড়ে যায়। অত্যধিক কায়িক শ্রমের, বিশেষত দৌড়ানোর সময় ধমনীর রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

কায়িক শ্রম থেমে যাওয়ার 2—3 মিনিট পরে নাড়ীস্পন্দন ও ধমনীর রক্তচাপ স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে।

কায়িক শ্রমে হৃৎস্পন্দন ও ধমনীর রক্তচাপ যে পরিমাণে বেড়ে যায় এবং যতটা দ্রুত সেগুলি স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে, তা বহুলাংশে অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল।

উন্নততর স্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর সক্রিয়তা ও অধিক বিশ্রাম — এর কোনটি বেশি কার্যকর? প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্য উভয়ই প্রয়োজনীয়। বিশ্রাম ও ঘুম আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু, কাজ অর্থাৎ সক্রিয়তাও প্রয়োজনীয় বটে।

শরীরচর্চা ও খেলাধুলা মানবদেহের সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের অনুষঙ্গ। রক্তবাহতন্ত্রের উপর শরীরচর্চার প্রভাব সবিশেষ অনুকূল বটে।

শরীরচর্চা হল নির্বাচিত অঙ্গসঞ্চালনভিত্তিক দৈহিক ব্যায়াম। এর সাহায্যে মাংসপেশী ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলিকে বিকশিত ও মজবুত করা যায়। শরীরচর্চা নিয়ন্ত্রক অভ্যাসগুলির উন্নতি ঘটায় এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে অবদান যোগায়।

শারীরিক ব্যায়াম গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগের কর্মতৎপরতা বাড়ায়। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা নিশ্চিত আবেগ ও উচ্চ মননশীলতা আনে। প্রসঙ্গত পাভলভের উক্তি এখানে কৌতুহলোদ্দীপক হবে। তিনি বলতেন যে তাঁর বুদ্ধিগত কার্যাদির চেয়ে কায়িক পরিশ্রমে তিনি বেশি আনন্দ পেতেন।

যে-সমস্ত প্রক্রিয়ায় শারীরিক ব্যায়াম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কাজের উন্নতি ঘটায় তা আজ সুবিদিত।

আগেই বলা হয়েছে কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন, ধমনীর রক্তচাপ এবং বিপাকক্রিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। গুরুমস্তিষ্ক থেকে আসা ঘাতগুলি মাংসপেশী ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গে পৌঁছনোর ফলেই এমনটি ঘটে। উপরন্তু, মাংসপেশী ও রক্তে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব ঘটে এবং কৈশিকা, ধমনীকা ও রক্তনালীর স্নায়ুপ্রান্তগুলিকে প্রভাবিত

করে। স্নায়ুতন্ত্রের ঘাত ও রাসায়নিক পদার্থগুলি অনুবেদী স্নায়ুগুলিকে উজ্জীবিত করে, হৃৎ-ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রায় দ্বিগুণিত করে এবং এভাবে হৃৎপেশীর পুষ্টি বাড়ায়। এতে শিরার রক্তপ্রবাহও বেড়ে যায় এবং হৃৎপিন্ডের দিকে রক্তপ্রবাহ সুগম হয়। এর ফলে বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ কোষকলাগুলি পুষ্টিকর দ্রব্য ও রক্তদ্বারা আমদানীকৃত অক্সিজেনকে ভালভাবে আত্তীভূত করতে পারে। শারীরিক ব্যায়ামের সময় গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়ার ফলে রক্ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

রক্তসঞ্চালনের তথাকথিত সহায়ক (হৃৎ-বহিস্থ হেতুর উপর প্রযুক্ত প্রভাবও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়ার সময় বক্ষা-ঞ্চল অধিকতর বিস্তৃত হয় এবং মধ্যচ্ছদাকে সজোরে নিচে নামায়। ফলে যকৃৎ থেকে রক্ত দ্রুত বের হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি হৃৎপিন্ডের দিকে রক্তপ্রবাহের গতিতে সহায়তা যোগায়। শারীরিক ব্যায়ামের সময় মাংসপেশীগুলি ছন্দবদ্ধভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এর ফলে শিরার উপর চাপ পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে এবং শিরার ভিতরের রক্ত হৃৎপিন্ডের দিকে প্রবাহিত হতে সহায়তা পায়।

সঠিকভাবে নির্বাচিত শরীরচর্চার মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়ালে দেহ শর্তবদ্ধ হয়, অর্থাৎ শরীর অল্প আয়াসে বেশি ফল পেতে পারে। যেমন, একজন সুশিক্ষিত ক্রীড়াবিদ, ক্লান্ত না হয়ে, ঘন ঘন শ্বাস না নিয়ে ধমনী-চাপ সামান্যও না বাড়িয়ে এবং নাড়ির গতি বিশেষভাবে ত্বরিত না করে যে-শারীরিক ব্যায়াম করতে পারে তা করতে এক অনভ্যস্ত ব্যক্তির হাঁপাতে হবে, তার নাড়ির স্পন্দন বেড়ে যাবে এবং সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

ব্যায়ামদক্ষ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন অপেক্ষাকৃত কম ও ধমনী-চাপ নিচু থাকে। প্রশিক্ষণ বস্তুত স্নায়ুতন্ত্র, মাংসপেশী ও শ্বাসতন্ত্রের কাজের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলে। হৃৎরক্তবাহতন্ত্র খোদ হৃৎপিন্ড সহ সমস্ত কোষকলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম হৃৎস্পন্দনে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত সরবরাহ করতে পারে আর ধীরস্পন্দন হৃৎপিন্ডকে বিশ্রাম দেয়। এটাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেহযন্ত্রের সুবিধা।

শারীরিক ব্যায়াম এই ধরনের প্রভাব বিস্তার করে কেবল পরিমিত মাত্রার শর্তেই। নিচের উদাহরণে তা ব্যাখ্যেয়। মধ্যম ধরনের পেশীগত কার্যকলাপ এমন কোন পদার্থের সৃষ্টি করে যা প্রান্তিক রক্তনালীগুলির

প্রসার ঘটিয়ে রক্তচলাচলের সুবিধা করে। পক্ষান্তরে মাংসপেশীগত অতিরিক্ত শ্রমসৃষ্ট পদার্থ প্রান্তিক রক্তনালীগুলিকে সঙ্কুচিত করে হৃৎপিন্ডের কাজে জটিলতা বাঁধায়।

প্রত্যেকের, বিশেষত বুদ্ধিজীবীদের জন্য শারীরিক ব্যায়াম অপরিহার্য। হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের উপর কায়িক শ্রম ও শারীরিক ব্যায়ামের সুপ্রভাব সম্পর্কে পাভলভ নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন: পেশীগত কাজ (অবশ্য অত্যধিক নয়) হৃৎপিন্ডের কার্যকরতা নিয়ন্ত্রণ করতে যতটা সাহায্য করে, পেশীগত কাজ ব্যতিরেকে বিভিন্ন উত্তেজক হৃৎপিন্ডের কাজে ততটাই বাধা সৃষ্টি করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যারা হালকা পেশীগত কাজ করে এবং জীবনের পরীক্ষা ও কঠোর দুঃখ-কষ্টে অধিকতর সাড়া দেয় তাদের হৃৎপিন্ডই বেশি রোগগ্রস্ত হয়।

ভোরবেলা আমরা যখন ঘুম থেকে উঠি, শোওয়া অবস্থা থেকে খাড়া হয়ে দাঁড়াই এবং বিশ্রাম থেকে কর্মে স্থানবদল করি তখন আমাদের ব্যায়াম করা উচিত।

শারীরিক ব্যায়ামের সময় ঠিকমত শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া একান্ত প্রয়োজন, অথবা কোষকলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন যোগানোর উপযোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বিশেষ ব্যায়াম করা উচিত। শ্বাস নেয়া উচিত সমভাবে, গভীরভাবে ও শুধু নাক দিয়ে। প্রত্যেকটি ব্যায়ামের পরই অল্প সময় শ্বাসক্রিয়ার ব্যায়াম করা উচিত। শ্বাসক্রিয়ার ব্যায়াম দুই প্রকার: নিষ্ক্রিয় — যখন হাত নিতম্বের উপর রেখে শ্বাসগ্রহণ ও নিশ্বাসত্যাগ দুটোই করা হয় এবং সক্রিয় — যখন হাত মাথার উপর রেখে শ্বাস গ্রহণ ও হাত নিচুতে নামিয়ে নিশ্বাস ত্যাগ করা হয়। নিশ্বাস ত্যাগ করা উচিত দেহ বাঁকা করে অথবা নুয়ে এবং শ্বাস গ্রহণ করা উচিত সোজা হয়ে অথবা বাঁকা অবস্থা থেকে উঠে।

প্রত্যেকটি ব্যায়ামে, হাঁটায় অথবা পাহাড়ে ওঠার সময় আমাদের গভীরভাবে এবং অবাধে শ্বাস গ্রহণ করা উচিত।

সব রকমের খেলাধুলা ও সক্রিয় ব্যায়াম, যেমন ভলিবল, ক্রিকেট, গ্রীষ্মে নৌকাবাওয়া, শীতে স্কেটিং ও স্কি-করা হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলে। সাঁতারকাটা (নদী, হ্রদ, সাগর অথবা পুকুরে) স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রথমত, ঠান্ডা জল শিরাগুলিকে প্রথমে একটু কুঞ্চিত এবং পরে স্ফীত করে। এটাও এক ধরনের 'হৃৎপিন্ডের ব্যায়াম'। এছাড়াও

সাঁতারের সময় আমরা ছন্দবদ্ধভাবে শরীরচালনা করি,যাতে আমাদের রক্তবাহতন্ত্র ও সমস্ত শরীরের অনুশীলনে সহায়তা করে।

শারীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস এবং সক্রিয় খেলাধুলা যদি অসংখ্য এবং বিভিন্ন ধরনের শর্তাধীন প্রতিবর্তভিত্তিক হয়, বিশেষত ব্যায়াম ও খেলাগুলি যদি মুক্তাঙ্গনে ও সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় তবে তা শরীরচর্চার আনন্দ ও স্বাস্থ্যপ্রদ সুফল সম্পর্কে অবহিত শরীরচর্চাবিদের কাছে দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে ওঠে। এমনকি দুর্বল, রক্তহীন ও সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এমন ছেলেমেয়েদেরও স্কুলপূর্ব বয়সে অথবা স্কুলে পড়ার সময় শরীরচর্চায় নিরুৎসাহিত করা মা-বাবার পক্ষে অনুচিত। স্পষ্টতই এইসব ছেলেমেয়েদের জন্য প্রায়শ শরীরচর্চা অবশ্যকর্তব্য। কারণ, তা তাদের হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে উন্নত ও শক্তিশালী করে এবং সমস্ত শরীরগঠনে সাহায্য যোগায়।

বিখ্যাত দৌড়বিদ জনামেন্‌স্কি (এখন প্রয়াত) আমাকে বলেছেন কিভাবে তিনি তাঁর গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন, যারা তাদের প্রথম যৌবনের নগ্ন নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে 'খাটো গরু' বলে ডাকত। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ তাঁকে একজন চ্যাম্পিয়ন দৌড়বীর হতে সাহায্য করেছে। প্রসঙ্গক্রমে, তিনি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের চ্যাম্পিয়ন তখন তাঁর হৃৎস্পন্দন ছিল বিশ্রামের সময় 40 ও ধমনী-চাপও আনুপাতিক কম।

শৈশবের গোড়ার দিকেই শরীরচর্চা শুরু করা এবং বার্ধক্য পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত। যে ব্যক্তি যত নিয়মিত ও দৃঢ়ভাবে শরীরচর্চা করে সেই ব্যক্তি তত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে ও তার কর্মক্ষমতা বহুদিন অটুট রাখতে পারে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন লোককে পুরোপুরি সুস্থ বলা যায় না, অর্থাৎ বিভিন্ন জীবিকা এবং কাজের উপযুক্ত বলে মনে করা যায় না, যদি সে অল্প দৌড়ের পরেই হাঁপাতে থাকে, অল্প ঠান্ডায় কিংবা পা ভেজালেই সর্দিতে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসক ও লেখক ভ. ভেরেসায়েভ তাঁর 'ডাক্তারী কড়চা' বইটিতে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আদর দিয়ে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে নেয়া যায় যে হাত ভেজালে ও হাতমোজা ছাড়া বাইরে গেলেই ঠান্ডা লেগে যায়। খেলাধুলা সমস্ত দেহকে শক্ত করে, বিশেষত রক্তবাহতন্ত্রের সহ্যশক্তি বাড়ায় এবং

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রনিয়ন্ত্রিত অভিযোজন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলে।

দীর্ঘ বিরতি ছাড়া শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখলে এমনকি পরিণত বয়সেও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। 50 বছর বয়সের পরেও স্কিটেল, ক্রোকেট, পদাযাত্রা, স্কেটিং ও স্কি-করা অনুমোদনীয় এবং চরম আকাঙ্খিত।

সম্প্রতি চিকিৎসাসম্মত শরীরচর্চা এক দৈনন্দিন অভ্যাস হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত শরীরচর্চা হৃৎরোগেও উপকারী। কিন্তু সেগুলি কেবল চিকিৎসকের উপদেশ ও কঠোর নির্দেশেই করা যেতে পারে।

কাজ ও বিশ্রাম

শারীরিক অথবা মানসিক কাজজনিত ক্লান্তি কেবল স্নায়ুতন্ত্রের বা যে-পেশীদ্বারা কাজ করা হয় সেই পেশীর ক্লান্তিতেই প্রতিফলিত হয় না। যে আবেগ নিয়ে কাজ করা হয় তার উপরই ক্লান্তির দ্রুতি মূলত নির্ভরশীল। একঘেয়ে, আনন্দহীন এবং নিরুৎসাহভাবে করা কাজে ক্লান্তি আসে তাড়াতাড়ি। কিন্তু আকাঙ্খিত, আনন্দকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজগুলি মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে শ্রমসাধ্য হলেও এতে ক্লান্তি কম থাকে।

আমরা সকলেই জানি যে গানবাজনা বা কোন উত্তেজক বক্তৃতার প্রভাবে ক্লান্তি দূর হওয়া সম্ভব। আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ স্বদেশপ্রীতির বহু জ্বলন্ত উদাহরণ রেখেছেন যা শুধু গণশৌর্য ও অশেষ বীরত্বই সৃষ্টি করেনি, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ও পশ্চাদভূমিতে শ্রমরতদের সহিষ্ণুতাও বাড়িয়েছে।

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় ভাবাবেগই হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। উপরন্তু, গুরুমস্তিষ্কের উদ্দীপক ও নিবারক প্রক্রিয়াগুলিকে কিছুটা তীব্রতাদানের মাধ্যমে ভাবাবেগ অনুবেদী স্নায়ু-গুলির উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয় এবং রক্তে এড্রিনেলিনের অধিক ক্ষরণ ঘটায়। ফলত মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড এবং কঙ্কাললগ্ন পেশীতে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয়, হৃৎরক্তনালীগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে, হৃৎপেশীর বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়ে তা কেবল হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের উপরই নয়, সমস্ত

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরও সুপ্রভাব বিস্তার করে এবং উৎফুল্ল ও আনন্দঘন ভাবের উদ্রেক ঘটায়। ঋণাত্মক ভাবাবেগ বিপরীতভাবে কাজ করে: গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগের উদ্দীপক ও নিবারক প্রক্রিয়াগুলির সমন্বয়ে বিঘ্ন ঘটে এবং রক্তনালীগুলি সঙ্কোচন ও রক্তসঞ্চালনের সকল প্রক্রিয়া সচলকারী ভেগাস স্নায়ুর উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থায় মানুষ অত্যন্ত খারাপ বোধ করে এবং উদ্বেগ ও স্নায়বিক পীড়ার লক্ষণ অনুভব করতে থাকে।

কাজের প্রতি মনোভাব এজন্য স্বাস্থ্যের অবস্থার পক্ষে এবং বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে বহুবিধ রোগ থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শারীরিক ও মানসিক কাজের মধ্যকার বিভাগ ক্রমেই আপেক্ষিক হয়ে উঠছে। একদিকে শারীরিক পরিশ্রম সহজতর করা হচ্ছে এবং শিল্প ও কৃষির ক্রমবর্ধমান যন্ত্রীকরণের ফলে হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের উপর চাপ কমছে, অপরপক্ষে এখনকার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির জটিলতার জন্য উচ্চতর সাধারণ শিক্ষা ও কিছুটা মানসিক শ্রম প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আজকাল এমন কোন কাজ নেই যাতে শুধুমাত্র কায়িক শ্রম দরকার। কিন্তু এমন কিছু কাজ আছে যাতে কায়িক শ্রম প্রায় নিষ্প্রয়োজন। এইসব কাজে নিযুক্ত লোকেরা বসে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে বা শরীরচর্চা মোটেও না করলে এবং সেইসঙ্গে অতিভোজনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তাদের ওজনবৃদ্ধি ও ধমনীকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। এজন্যই তাদের পক্ষে নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা এবং অতিভোজন এড়িয়ে উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়।

কৃষিকাজের একটা সুবিধা হল এই যে এতে দীর্ঘসময় ঘরের বাইরে থাকতে হয় (এতে গভীরতর শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া সহ রক্ত অধিকতর অক্সিজেনসম্পৃক্ত হয়)। এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে ক্লান্ত রাখে এবং বিশেষত পেশীর কঠোর পরিশ্রমের সময় হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের জন্য উন্নততর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সূর্যালোক, খোলা বাতাস ও তাপমাত্রার তীব্র পরিবর্তনের মধ্যে থাকা খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ।

সোভিয়েত শিল্পসংস্থাগুলির লক্ষ্য হল কাজের সর্বোত্তম ব্যবস্থা, কারখানার দালানগুলিতে বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত, উপযুক্ত তাপ, আর্দ্রতা, আলোর বন্দোবস্ত ইত্যাদি।

এই ব্যবস্থায় কাজ স্বাস্থ্যের উপর সুপ্রভাব ফেলে এবং তা ব্যক্তিত্ব

বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য হয়েওঠে। বলাবাহুল্য, এইব্যবস্থা সুস্থ দেহের এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কিছু কিছু রোগে পেশাগত চিকিৎসা, অর্থাৎ শ্রমের সাহায্যে চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অন্যান্য বহু হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগে উপযুক্ত পেশানির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ ডাক্তারী পরীক্ষার পর রোগীর কাজ করার সামর্থ্য নির্ধারণ করা উচিত।

রোগীর পেশা, কাজের শর্ত এবং রোগীর দেহ ও মনের উপর প্রযুক্ত প্রভাব অবশ্যই পরীক্ষণীয়। কেবল তখনই রোগীর দক্ষতা রক্ষা বা পুনরুদ্ধারের জন্য তার কাজের সুবিধাজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে রাতের কাজের বদলে দিনের কাজ দেয়া, ঠাণ্ডা জায়গা থেকে গরম জায়গায়, দাঁড়িয়ে কাজ করার চেয়ে বসে কাজ করতে দেয়া, ইত্যাদি উচিত। কিন্তু রোগীর জন্য পেশানির্ধারণে তার অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, তার কাজের প্রতি ভালবাসা এবং সেই দলের সঙ্গে তার সম্বন্ধও বিচার্য।

বয়স্কদের মধ্যে যাদের সবেমাত্র হৃৎরোগ দেখা দিতে শুরু করেছে তাদের সহজসাধ্য ও আনন্দদায়ক কাজ দেয়ার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সময়মত ও উপযুক্ত বিশ্রাম প্রয়োজন। যারা ঘরে বসে কাজ করে তাদের জন্য কয়েক ঘণ্টা পর পর ১০ — ১৫ মিনিট বিশ্রাম নেয়া ভাল। বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করার জন্য এই সময়টুকুতে একটু শরীরচর্চা করা উচিত। কারখানার শ্রমিক ও অফিসকর্মীরা কাজের মধ্যবর্তী সময়টুকুর অবশ্যই সদ্ব্যবহার করবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাভলভ দেখিয়েছেন যে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে নিদ্রা একটি রক্ষাকারী প্রতিবন্ধ। প্রত্যহ একই সময়ে ঘুমুতে যাওয়া উচিত। ঘুমের পূর্বমুহূর্তে নৈশাহার অনুচিত। কারণ, ঘুমুতে যাওয়ার আগে প্রচুর খেলে দুঃস্বপ্ন দেখা ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা সম্ভব। ঘুমের আগে বাইরে কিছুক্ষণ হাঁটা সর্বদাই স্বাস্থ্যপ্রদ।

যারা রাতে কাজ করে তাদের দিনে যথেষ্ট ঘুমানো প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দিনকাটান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সকলেই জানি যে গ্রামে প্রমোদভ্রমন — সেখানে নৌকা

বাওয়া, সাঁতার কাটা, গ্রীষ্মে হ্রদের তীরে শুয়ে থাকা এবং শীতে স্কী-করা আমাদেরকে কতটা সজীব করে তোলে। অবসর বিনোদন, ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের উপর নির্ভরশীল। কেউ থিয়েটার বা সিনেমায় যায়, কেউ বা জাদুঘর কিংবা প্রদর্শনীতে, আবার কারও পছন্দ শখের কর্মী হিসেবে শিল্পকাজে যোগ দেয়া। এক ধরনের কাজ থেকে অন্য কাজে, বিশেষত মানসিক কাজ থেকে কায়িক শ্রমের কাজে যাওয়াটা খুবই স্বাস্থ্যকর। কৌতূহলপ্রদ কাজের সঙ্গে যুক্ত অনুভূতি ও ধনাত্মক ভাবাবেগ পরিবর্তন ও সুখকর বিশ্রাম খুবই উপকারী।

প্রফুল্লতা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং অকালবার্দ্ধক্য রোধের জন্য পদব্রজে দীর্ঘভ্রমণ ও পর্বতারোহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ পদযাত্রায় অভ্যস্ত লোকের প্রকৃতির স্বাস্থ্যপ্রদ সম্পদগুলির সংস্পর্শে আসা ও তাজা অক্সিজেনসমৃদ্ধ বায়ু সেবনের অঢেল সুযোগ থাকে। শরীরকে শক্ত করার কাজটি ধারাবাহিক হওয়া উচিত। এমন অনেক বৃদ্ধ আছে যারা পায়েহাঁটা, ভ্রমণ, বিশেষত এগুলি শিকার ও মাছধরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে অন্য ধরনের বিশ্রাম বা আমোদপ্রমোদ কল্পনাও করতে পারেনা। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এর চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।

অন্যান্য খেলাধুলা, যেমন সাঁতার, জলের পোলো খেলা, নৌকা বাওয়া, ভলিবল, টেনিস, বিবিধ গ্রীষ্মকালীন খেলা, শীতের স্কেটিং, স্কী এবং পুকুরে সাঁতার কাটা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। যারা স্বাস্থ্য, আনন্দ ও সমর্থদেহ চায় তাদের জন্য দৈহিক শ্রম এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ, একটি অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত।

স্নায়ুবিকার প্রতিরোধ

নানা মানসিক অবস্থা কত সহজে ও সবাভাবিকভাবে যে হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে প্রভাবিত করে তা সকলেই জানে। সুস্থ ও রুগ্ন লোকদের উপর বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে চিকিৎসকরা তা সত্যায়ন করেছেন। উচ্চতর স্নায়বিক কাজের বিশৃঙ্খলা, প্রারম্ভিক পর্যায়ে মূলত যেগুলিকে বলা যায় স্নায়বিক বিকার, সেগুলি হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগবৃদ্ধিতে অবদান যুগিয়ে থাকে। তাই হৃৎরোগ রোধের জন্য স্নায়ুবিকার প্রতিরোধ একান্ত প্রয়োজন।

শর্তবদ্ধ প্রতিবর্তক্রিয়া বিশদকরণের নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার সময় এবং বিশেষত পরীক্ষামূলক স্নায়ুরোগ সৃষ্টির সময় পাভলভ লক্ষ্য করেছেন যে একই উত্তেজক বিভিন্ন কুকুরের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এইসব পরীক্ষা থেকে পাভলভ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়ার বিভিন্ন রকমফের আছে এবং কুকুরের স্নায়ুতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নিরিখে কুকুরগুলি একই উত্তেজককে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়।

উচ্চতর স্নায়বিক কার্যের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাভলভকে কুকুরগুলি কোন ধরনের তা নির্ধারণের ভিত্তি যুগিয়েছিল: মৌলিক স্নায়বিক প্রক্রিয়াগুলির শক্তি — উত্তেজক ও দমনমূলক, এই প্রক্রিয়াগুলির সমন্বয় এবং সেগুলির সঞ্চরণশীলতা (যে দ্রুততার সঙ্গে একটি পদ্ধতি আরেকটি পদ্ধতির স্থানপূরণ করতে পারে)।

চূড়ান্ত ধরনগুলি একদিকে শক্তিশালী ও উত্তেজক এবং অন্যপক্ষে দুর্বল ও নিবারক ধরনের। কেন্দ্রীয় ধরন হল সংযত উচ্ছল ও সংযত শান্ত।

যখন আমরা শক্তিশালী ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের কথা বলি তখন আমরা ক্লান্তি ছাড়া, উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্রের কাজের বিশৃঙ্খলা ছাড়া মস্তিষ্কের কোষকলার শক্তিশালী ও বিলম্বিত উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতার কথা বোঝাই। দুর্বল ধরনের গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগের স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজনায় অপেক্ষাকৃত সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। স্থিতিশীল ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের কাজে উত্তেজনা এবং নিরোধ পরস্পর যুক্ত থাকে। এই ধরনটিকে আরও দুভাগে ভাগ করা যায় — উচ্ছল ও শান্ত। উচ্চতর স্নায়বিক কাজের ধরন কিছুটা স্নায়ুতন্ত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তা প্রাণী বা মানুষের সামগ্রিক জীবন ও শিক্ষার প্রভাবের ছাঁচে গঠিত হয়।

উচ্চতর স্নায়বিক বৈশিষ্ট্যগুলি (ধরন) বা মেজাজ মানুষ ও পশু উভয়ের স্নায়ুবিকারের উদ্ভব ও চিকিৎসায় কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করে। পাভলভ বিভিন্ন মেজাজের লোকের চরিত্র চিহ্নিত করেছিলেন এইভাবে: বিষন্ন মেজাজ হল স্পষ্টতই নিবারক স্নায়ুতন্ত্রের ধরন; বিষন্ন লোকের কাছে জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাই নিবারক হেতু হয়ে ওঠে, কেননা সে

কোন কিছুই বিশ্বাস করেনা, কোন কিছুতেই আশা দেখে না, প্রত্যেক জিনিসেরই মন্দ দিকটা দেখে এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই 'দোষারোপ' প্রত্যাশা করে। উৎসাহহীন লোক হল মুখচাপা, আবেগপ্রবন, সহজে ও তাড়াতাড়ি উত্তেজিত হয়। পরবর্তী দুই ধরনের মেজাজকে পাভলভ চিহ্নিত করেছেন সুস্থ, স্থায়ী ও প্রকৃতই জীবন্ত ধরন হিসাবে। উৎসাহহীন ব্যক্তি হল মুখচাপা ও শান্ত, — জীবনে অধ্যবসায়ী, অদম্য পরিশ্রমী। আশাবাদী লোক খুবই উদ্যমী ও সৃষ্টিশীল, কিন্তু তা কেবল তখনই যখন তার কাজ থাকে প্রচুর ও আনন্দদায়ক। অর্থাৎ, যদি সর্বক্ষণ উত্তেজনা থাকে। এই ধরনের কাজ না থাকলেই তাকে একঘেয়েমি ও কুঁড়েমিতে পেয়ে বসে...।

কিন্তু মানুষের পক্ষে তার সামাজিক পরিবেশ এবং আশৈশব যে-অবস্থায় লালিত তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যে-ব্যক্তি তার জীবনের সর্বক্ষণ শ্রমের পরিবেশে বাস করেছে এবং সেখানেই তার স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, জীবনের সহজ ও জটিল সমস্যাগুলিকে স্বাধীনভাবে সমাধান করতে অভ্যস্ত হয়েছে, শিশুকাল থেকেই কর্মঠ ও উৎসাহী কর্মী হওয়ার শিক্ষালাভ করেছে (স্কুলের চক্রগুলিতে, ক্রীড়াসমিতিতে ও বাড়িতে) এবং শক্তিশালী স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী হয়েছে, সে কখনই স্বাভাবিক মস্তিষ্কক্রিয়ার বিকৃতি দেখাবে না, নিজের চেষ্টায় নতুন জীবন গড়তে সমর্থ হবে ও অপেক্ষাকৃত সহজে (স্নায়ুবিকারের লক্ষণ ছাড়াই) সহিষ্ণুতার সাথে নিজ জীবনের কঠিন সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পারবে। অপরপক্ষে যে-ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল ধরনের, যে জীবন ধারণের শিক্ষা পায় নাই, সে অপেক্ষাকৃত কম আঘাতেই নেতিয়ে পড়বে, তার মাথা খারাপ হয়ে থাকে এবং সহজেই তার স্নায়ুবিকার দেখা দেবে।

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে দেখান হয়েছে যে পুষ্টিকর খাদ্য, শরীর দৃঢ়করণ, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, পেশাগত কাজ সবকিছুতেই উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়া (মন) যুক্ত থাকে এবং মনকে প্রভাবিত করে প্রফুল্ল ও প্রানবন্ত ভাব সৃষ্টিতে সহায়তা দেয় এবং গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগের উত্তেজনা ও নিবারক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক সম্পর্কের নিশ্চয়তা বিধান করে। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিশেষত স্নায়ুবিকাররোধে এই সম্পর্কটি প্রয়োজনীয়। আমি আরও কয়েকটি প্রয়োজনের কথা

উল্লেখ করব যেগুলি পূরণ করলে স্নায়ুতন্ত্রকে অতিরিক্ত উত্তেজনা ও উদ্বেগ থেকে বাঁচান যাবে।

উত্তেজনা ও উদ্বেগের অনেক কারণ থাকে এবং সেগুলি লোকভেদে ভিন্নতর হয়। কখনো এই কারণগুলি ব্যক্তিবিশেষ দূর করতে পারে, কিন্তু প্রায়শই এজন্য প্রয়োজন হয় এক বিশেষ গোষ্ঠির প্রচেষ্টা — যেমন পরিবারের লোকজন বা সহকর্মীদল কিংবা জনসাধারণ ও সরকারী সংস্থার সক্রিয় হস্তক্ষেপ।

পরিবারের লোকদের মধ্যে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যরক্ষায়, বিশেষত স্নায়ুবিকার ও হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধে এগুলির অবদান বর্ণনার মতো স্থান এখানে আমাদের নেই। আমি কেবল এটুকুই উল্লেখ করব যে বিদ্যালয়, পরিবার, শ্রমিক বা ছাত্রদের যৌথসংস্থা, ভাল বইপড়া মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং স্নায়ুতন্ত্রের স্থিরতাবিধানে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এটা সহজবোধ্য যে এগুলি স্নায়ুবিকার ও হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের পীড়া নিরোধে একটি বড় রকমের ভূমিকা পালন করতে পারে।

সামাজিক কাজ হল প্রকটি বিশেষ কার্যকর শিক্ষামূলক উপাদান। কেননা তা মানুষকে তার নিজের দিক থেকে অন্যদিকে মনযোগ দিতে সহায়তা যোগায়। নিজেকে নিয়ে বেশি ব্যস্ততা প্রায়ই ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও অসহ্য করে তোলে, যেগুলি সমাজসেবার সঙ্গে তুলনায় নিতান্তই নগন্য।

আর একটিমাত্র প্রশ্নই উল্লেখ করব যা উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকে (মনকে) এবং তার মধ্যে দিয়ে হৃৎরক্তবাহতন্ত্র তথা পুরো শরীরকে প্রভাবিত করে।

কথা বলা ও বই পড়া উভয়ই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আবেগের উৎস হতে পারে। যেমন, আমাদের ক্লিনিকে যেসব রোগীকে ধনাত্মক আবেগে অভিভাবিত এবং যাদের দ্রুত আরোগ্য লাভে প্ররোচিত করা হয়েছে তাদের রক্তে অচিরেই পরিবর্তন এসেছে (বিশেষত, ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পেয়েছে) এবং তাপনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটেছে। এই ঘটনাগুলি সহজেই ব্যাখ্যেয়, যদি আমরা মনে রাখি যে হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের সবগুলি দিকই অসংখ্য প্রতিবর্তক্রিয়ার সহিত যুক্ত এবং এজন্য এগুলি গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগের অধীন। প্রাণীর উপর শর্তাধীন প্রতিবর্তক্রিয়ার পরীক্ষাগুলি বিশদ করার সময় গুরুমস্তিষ্কের

বহির্ভাগের উত্তেজনা ও নিবারক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা সংঘর্ষ ঘটান যায় এবং হৃৎস্পন্দনের নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

মস্কোর জনৈক চিকিৎসক গ. জাখারেইন (১৮৩০-১৮৯৬) চিকিৎসায় মানসিক দিকগুলির ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করতে হলে রোগী তার অবস্থার যে-সব ভাল দিক বুঝতে পারেনা বা, উপলব্ধি করতে পারেনা; সেগুলির প্রতি তার মনযোগ আকর্ষণ করে তাকে রোগ নিরাময় সম্বন্ধে আশাবাদী করে তুলতে হবে ও তাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যমূলক উৎসাহ রোগীকে অচিরেই তার ঘুমের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়। 'হতাশার পরিবর্তে প্রফুল্লতার সুফলের' উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

কথোপকথানের সময় রোগীর উপর আরোপিত নেতিবাচক ভাবাবেগ তার উপর বিশেষ ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ডাক্তারী বই পড়া ও বইয়ের ভুল ব্যাখ্যার ফলে রোগীদের মধ্যে আবেগের 'স্ব্যাভিভাবন' দেখা দিতে পারে। দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে, বেশি স্পর্শকাতর রোগীরা ডাক্তারী পরিভাষার সঙ্গে অজ্ঞ থাকার দরুন ডাক্তারী পরীক্ষার সময় মানসিক আঘাত পায়। যেমন, হৃৎপিন্ডের অতিতুচ্ছ স্ফীতি, 'অর্ধশয়ান' কিংবা 'ঝুলান' অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যবান হৃৎপিন্ড বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত এই শব্দগুলি যদি এক্সরে-কক্ষে রোগীর সামনে কোন চিকিৎসাকর্মী অসতর্কভাবে বলে, তাহলে রোগী ভয় পেতে এবং তার মানসিক বিপর্যয় ঘটতে পারে, হৃৎপিন্ডের প্রতি সে মনোযোগী হয়ে উঠতে পারে এবং ফলত, হৃৎপিন্ডের স্নায়ুবিকার ঘটতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করা উচিত। কারণ, এতদ্দ্বারা জনসাধারণ কিছু সংখ্যক প্রশ্ন ও অবস্থার সাথে পরিচিত হতে পারে ও ফলত সেগুলি রহস্যজনক ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য হারাবে।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্নসৃষ্টিকারী কতকগুলি স্নায়ুবিকারের কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। আমাদের আরও যোগ করা উচিত: এই অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত যাবতীয় উপদেশ, যেমন উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য, শরীর শক্ত করা, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, উপযুক্ত পরিশ্রম ও বিশ্রাম — স্নায়ুবিকার প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন মাত্রায় মদ্যপানজাত প্রমত্ততার জন্য ক্রিয়াশক্তিহীনতা অর্থাৎ রক্তপ্রবাহ নিয়ামক স্নায়ুকেন্দ্রের আকস্মিক টোন-হ্রাস ও আনুষঙ্গিক হৃৎপেশীর দুর্বলতার জন্য মৃত্যু ঘটতে পারে। এতে প্রায়শ মৃত্যু না হলেও শ্বাসকেন্দ্রেই পক্ষাঘাত ঘটে। মদ শিশুদের শরীরের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর। দশ বছরের কম বয়সী কোন শিশু মাত্র ১০০ গ্রাম ভোদকা খেলেই মারা যেতে পারে। মদ্যপানে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত কোন বয়স্ক ২০০ গ্রাম মদ খেলেই তীব্র মত্ততাজনিত কারণে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

খালি পেটে মদ্যপান সবচেয়ে বিপজ্জনক। মদ পাকস্থলীতে যাওয়ামাত্রই রক্তে মিশে যাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি মাতলামি শুরু হয়।

নিয়মিত মদ্যপান সারা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ক্রনিক অ্যালকহলিক মত্ততা সৃষ্টি করে: স্নায়ুতন্ত্র ও হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কাজ বিঘ্নিত হয়, বিপাকক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ঘটে, ক্ষতিকর প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা কমে এবং কর্মশক্তি দ্রুত হ্রাস পায়, বা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি, প্রতিদিন অল্পমাত্রায় মদ্যপানও শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

বিয়ারে বিশুদ্ধ সুরার মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কিন্তু তা প্রায়ই বেশি পরিমাণে পান করা হয় এবং সেজন্য বেশি বিয়ার পান প্রচুর মদ্যপানেরই সামিল হয়ে ওঠে। উপরন্তু বিয়ারে অনেক পুষ্টিকর পদার্থ থাকায় বেশি পরিমাণে তা খেলে দেহস্ফীতি ঘটে এবং ফলত হৃৎপেশীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। হৃৎপিণ্ড স্ফীত (বিয়ার হার্ট) হয় এবং তার সঙ্কোচনশীলতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

পাভলভ ল্যাবরেটরির কর্মী ম. পেত্রভা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে উচ্চতর স্নায়ুবিক কাজের নিরিখে মদ্যপানজনিত উন্মত্ততায় তারতম্য ঘটে। সুরার প্রতিক্রিয়ায় স্নায়ুবিকারের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় অথবা অন্য কারণজাত স্নায়ুবিকারের লক্ষণগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং তা হৃৎরক্তবাহতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা ঘটায়। তাই মদ্যপানের কুফল হিসাবে উচ্চরক্তচাপ, শ্বাসার্তি-হৃৎশূল এবং ধমনীকাঠিন্য দেখা দেয়ার পরিস্থিতি ঘটতে পারে।

মদের প্রতিক্রিয়ায় রক্তনালীগুলির, বিশেষত হৃৎপিণ্ডের ও মস্তিষ্কের নালীগুলির ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতি হিসাবে রক্তনালীর দেয়ালগুলির পরিবর্তন ঘটে এবং রক্তজমাটের সম্ভাবনা বাড়ে, যেজন্য হৃৎপেশীভঙ্গ ঘটাও সম্ভবপর। অত্যধিক মদ্যপানে পুরো শরীরের ও বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের যে ক্ষতি ঘটে এতেই তা সহজলক্ষ্য।

ধূমপান, বিশেষত অবিরাম ধূমপান একটি মারাত্মক কুঅভ্যাস।

নিকোটিন নামের যে-বিকারকের উপর তামাকের সক্রিয়তা নির্ভরশীল তা ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে সবিশেষ ক্ষতিকর। ধূমপানের কুফলগুলি: ধমনীর উচ্চচাপ, নাড়ির স্পন্দনবৃদ্ধি এবং হৃৎপিণ্ডের কাজের নিত্য অনিয়ম। অধিক নিকোটিন গ্রহণে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালীগুলি সংকুচিত হয় এবং কখনো কখনো মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলির প্রচণ্ড আক্ষেপ দেখা দেয়। নিকোটিন-অসহিষ্ণু বা ধূমপানে অনভ্যস্ত কেউ একটি মাত্র সিগারেট খেলেই তার মধ্যে নিকোটিনের বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে: মাথা ঝিমঝিম, অধিক লালা-ঝরা এবং হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর কাজের কিছু কিছু বিঘ্ন। এক্ষেত্রে হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কাজে সাময়িক বিশৃঙ্খলা চলতে থাকলে পরিণামে তা ভয়ানক রোগে পরিণত হতে পারে।

ধূমপানের ফলে স্নায়ুবিকার, উচ্চরক্তচাপ, ধমনীকাঠিন্য, কণ্ঠনালীপ্রদাহ, হৃৎপেশীভঙ্গ, মাঝে মাঝে খুঁড়িয়ে চলা — হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের এই রোগগুলি বেড়ে যায় এবং কখনো কখনো তা ধমনীতে প্রচণ্ড আক্ষেপ সৃষ্টির মূল কারণ হয়ে ওঠে।

ধূমপান ছেড়ে দেওয়া খুব সহজ নয়। কিন্তু এর সাংঘাতিক কুফল সম্বন্ধে অবহিতদের পক্ষে অভ্যাসটি ছেড়ে দেয়ার মনোবল থাকে। যাহোক ধূমপায়ীরা সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই ক্ষতিকর অভ্যাস ছাড়তে না পারলে তারা কোন ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন, যিনি কখনো কখনো মনসমীক্ষা অথবা সম্মোহনের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

উপসংহারে আরেকবার জোর দিয়ে বলা উচিত যে, ব্যক্তির সমর্থন দ্বারা রোগপ্রতিরোধের ব্যক্তিগত চেষ্টা, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ সংগ্রামে সকলের শরিকানা এবং হৃৎপিণ্ডকে মজবুত করার ও হৃৎরোগরোধের জন্য রোগীর প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন স্বাস্থ্যোন্নয়ন ব্যবস্থাই সফল হতে পারেনা।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর ব্যাধি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত রোগবিরোধী পদ্ধতিগুলির আত্যান্তিক প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে বুঝতে হলে যেসব কারণে প্রায়ই হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগগুলি ঘটে এবং কোন পরিস্থিতি এই রোগ শুরু হতে, বাড়তে সহায়তা যোগায়, তা অবশ্যই জানা উচিত। এগুলিই বর্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়।

বর্ণিত রোগগুলির লক্ষণসমূহের বিশদ বিবরণ দেয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ একজন চিকিৎসকই কেবল রোগীর সযত্ন ও সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষা থেকে রোগনির্ণয় করতে পারেন। এক্ষেত্রে রোগের একেবারে গোড়ায় ধরা-পড়া লক্ষণগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণই যথেষ্ট। এইসব লক্ষণগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই রোগী যথাসময়ে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবে এবং তাকে নিজ অবস্থা পরিস্কার এবং সুষ্ঠভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

রোগীর চিকিৎসা অবশ্যই ডাক্তারের দায়ীত্ব এবং আমাদের এই বইটি কোন অবস্থাতেই ডাক্তারী পরামর্শের বিকল্প হতে পারেনা, হবেও না। রোগের অবস্থা, বিশেষত রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য ও শারিরীক অবস্থার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে একমাত্র ডাক্তারই রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ও তার জীবনযাপন প্রণালী ও কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন। তাই আমরা এখানে বিভিন্ন ওষুধের বিবরণ এবং অন্যান্য চিকিৎসা — যা প্রয়োগ করলে গুরুতর অসুখ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় — সেগুলির বিশদ বর্ণনা থেকে বিরত থাকব। কিন্তু কিভাবে রোগী ও তার আশপাশের লোকরা রোগের বৃদ্ধিরোধ ও তার আরোগ্যের একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান যোগাতে পারে, আমরা সংক্ষেপে তাই বলব। অর্থাৎ, আমরা পরিশ্রম ও বিশ্রাম সম্পর্কে, রোগীর

কাজ চালিয়েযাওয়া উচিত কিনা, তার পারিবারিক পরিবেশ, খাবার, ঘুম ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে উপদেশ দেব।

হৃৎরক্তবাহতান্ত্রিক স্নায়ুবিকার

হৃৎরক্তবাহতান্ত্রিক স্নায়ুবিকার হল উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলাজাত সাধারণ স্নায়ুবিকারের একটি অংশ। তীব্র মানসিক আঘাত এবং এইসঙ্গে মনের পক্ষে বিব্রতিকর আকস্মিক ও অস্বাভাবিক কঠিন সমস্যা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সহ দ্রুত স্নায়ুবিকার ঘটাতে পারে।

উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়ার উপর ক্রমান্বয়ে চাপ পড়লে তা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, স্নায়ুতন্ত্র নিজেকে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সাধারণত কোন স্নায়ুবিকার জন্মেনা। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী বা ঘন ঘন মানসিক আঘাত যদি ব্যক্তিগত বা কর্মজীবনের অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রামের অভাবে স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে তাহলে স্নায়ুবিকার দেখা দিতে পারে।

কুকুরের উপর পাভলভ-কৃত পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে রুগ্ন প্রত্যঙ্গ থেকে (যেমন অন্তস্রাবী গ্রন্হিসমূহ) দ্রুত স্নায়ুবিকার ঘটতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যেমন, প্রৌঢ়ত্বজ মনঃপরিবর্তনের সময় স্ত্রীলোকদের কখনো কখনো স্নায়ুবিকার জন্মে। কারণ, তখন তাদের ডিম্বাশয়ের কার্যকলাপে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। বহুপুরাতন রোগগ্রস্ত আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ থেকেও স্নায়ুবিকার জন্মে থাকে।

যক্ষারোগ, রক্তশূন্যতা ও অন্যান্য পুরাতন অসুখ থেকে সমস্ত দেহের, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের ক্লান্তি আসে। অবিরাম ব্যথা থেকে (যকৃৎ বা কিডনির শূলে) যাদের স্নায়ু দুর্বল তাদের স্নায়ুবিকার ও শেষে হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

ইতিপূর্বে হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত ছিল এমন ব্যক্তির মানসিক আঘাত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুবিকার হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তা সাধারণ মূল রোগটি বাড়ায় এবং রোগীকে অকর্মণ্য করে তোলে। যেমন, আমাদের একজন হৃৎরোগে আক্রান্ত স্ত্রীলোকের আনুষঙ্গিক রক্তসঞ্চালণের বিশৃঙ্খলা ছিলনা। সে বেশ কঠিন কায়িক শ্রম করতে পারত। কিন্তু

একটি মানসিক আঘাতের (ডাকাতের আক্রমণ) পর তার অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন ও পায়ে শোথ জন্মে। পরে তাকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। মহিলাটির স্নায়ুরোগ সেরে যাওয়া মাত্র তার কর্মক্ষমতা ও হৃৎপিন্ডের কাজ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

অতিরিক্ত যৌনকর্ম ও যৌন অস্বাভাবিকতা থেকেও হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্নায়ুবিকার দেখা দিতে পারে।

একটিমাত্র কথা, মুখের কথাও সময়ে সময়ে স্নায়ুবিকার ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক পরীক্ষক দেখিয়েছেন যে মৌখিক নির্দেশ ও সম্মোহন শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে।

এটাও দেখান হয়েছে একটি কথা হৃৎরক্তবাহতন্ত্র ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গের কাজের প্রতিবর্তী উত্তেজক হয়ে উঠতে পারে। এটা হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের মাত্রা বাড়াতে বা কমাতে, রক্তচাপ বাড়াতে, চোখের মনি স্ফীত ইত্যাদি করতে পারে।

এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, কেন অপ্রীতিকর অলোচনা এবং কখনো কখনো পৃথক শব্দ, ইঙ্গিতও হৃৎপিন্ডের স্নায়ুবিকার বৃদ্ধিতে সহায়তা যোগাবে। কথার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি আমাদের জানা ও বোঝা উচিত। কারণ, কথাই তো মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের বাহন। অতএব আমরা যেন প্রকৃতির এই অপূর্ব উপহারটি সতর্কতার সহিত ও সৎভাবে ব্যবহার করি।

মস্তিষ্কের বহির্ভাগের ক্রিয়া দুর্বল হলে নিম্নবহির্ভাগের স্নায়বিক যন্ত্রগুলি ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্রের উপর তার 'নিয়ন্ত্রণ' হারিয়ে ফেলে: হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং এই তন্ত্রের স্নায়ুবিকার দেখা দেয়। এই অবস্থা ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যেকার স্বাভাবিক সমন্বয়কে দুর্বল করে দেয়, ভেগাস ও অনুবেদী স্নায়ুর কাজের স্বাভাবিক সম্পর্কে, রক্তচাপ, হৃৎপিন্ডের রক্তনালীগুলির মধ্যে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়বিক যন্ত্রগুলির সমন্বিত কার্যক্রম প্রভৃতিতে বিঘ্ন ঘটায়।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্নায়ুবিকারের লক্ষণগুলি বহু ধরনের। রোগীরা অভিযোগ করে যে তারা তাদের 'হৃৎপিন্ডকে অনুভব' করে, বিশেষত

বাম দিকে কাত হয়ে শুয়ে থাকলে। বাম স্তনাগ্রে তারা অপ্রিয় অনুভূতি এবং কখনো কখনো এমনকি ব্যথাও বোধ করে, যদিও যথানিয়মে তা বুকের অন্যত্র ছড়ায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীরা বুকধড়ফড়ানি অথবা হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়া বা বসে-যাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে অভিযোগ করে। এইসব অনুভূতির সাথে উদ্বেগও থাকে। কোন কোন রোগীর ঘুম খুব কম হয়, মেজাজ খিটখিটে থাকে ও বিশেষত কোন কষ্টকর কাজ বা মানসিক কাজের পর সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো তারা গভীর শ্বাস নিতে না পারার অভিযোগ করে।

রজস্রাব থামার সময় কোন কোন বয়স্কা মহিলা তথাকথিত ঋতুজরাজনিত স্নায়ুবিকারে ভোগে। কখনো কখনো তাদের মুখ লাল হয়ে ওঠে (শরীর গরম হয় ও ঘেমে যায়) বিশেষত, কোন গরম ঘরে থাকলে বা উত্তেজিত হলে।

হৃৎপিণ্ডের আকস্মিক দ্রুতগতি নামের রোগটিও হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুবিকারের অন্তর্ভুক্ত। দ্রুত হৃৎস্পন্দনের আক্রমণই এই রোগের লক্ষণ।

হৃৎরক্তবাহগত স্নায়ুবিকারের রোগীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই রোগের সঙ্গে হৃৎপিণ্ড বা রক্তনালীর কোন সংযোগ নাই। কোন কোন রোগীর নাড়িস্পন্দন দ্রুততর হয় (অনুবেদী স্নায়ুর বর্ধিত উত্তেজনা)। পক্ষান্তরে অন্যদের নাড়িস্পন্দন মন্থর হয়ে ওঠে (ভেগাসের বর্ধিত উত্তেজনা)। কখনও কখনও দেখা গেছে যে হৃৎস্পন্দনের এই বিশৃঙ্খলা ভেজিটেটিভ স্নায়ুতন্ত্রের কোন কোন বিভাগের বর্ধিত উত্তেজনার ইঙ্গিত বহন করে।

বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুবিকার চিকিৎসায় প্রথমেই প্রয়োজন রোগের কারণগুলি দূর করা, মস্তিষ্কের বহির্ভাগের কাজকে স্বাভাবিক করা। এজন্য চাই উপযুক্ত কাজ ও বিশ্রাম, প্রচুর নিদ্রা ও নির্মল বায়ু। রোগীকে নিশ্চয়তা দেয়া ও প্রফুল্ল রাখা খুবই প্রয়োজন। স্নায়ুতন্ত্রের কাজনিয়ন্ত্রক কিছু কিছু ওষুধ (এককভাবে ব্রোমাইড বা কেফিন, ব্রোমিউরাল, ভালেরিয়ানের সঙ্গে) খুবই কার্যকর।

রোগী নিদ্রাহীনতায় ভুগলে 'সম্মোহন' চলতে পারে। এই ওষুধগুলি সকল লোকের উপর সমান ভাবে কাজ করেন এবং সেজন্য রোগীর স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধের মাত্রা ঠিক করা দরকার। এই ওষুধগুলি কেবল ডাক্তারের বিধান মতোই ব্যবহার্য এবং

তার নির্দেশ অবশ্যই যথাযথ পালনীয়। অনিদ্রা-রোগীর পক্ষে ঘুমানোর আগে ৩০-৪০ মিনিট ধীরে হাঁটা খুবই উপকারী।

কোন কোন স্নায়ুবিকার চিকিৎসায় চিকিৎসকরা রোগীর দৈনিক ঘুমের সময় ১০-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বা আরও বেশী বাড়ান। দীর্ঘ ঘুমের এই চিকিৎসাটি কেবল হাসপাতালে ডাক্তারদের দেখাশোনার আওতায় করা হয়।

সঠিক ও অবিরাম চিকিৎসা এবং এইসঙ্গে স্নায়ুবিকারের কারণগুলি দূর করলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ সম্ভব।

রক্তবাহতন্ত্রের স্নায়ুবিকারে রোগীর সামর্থ্য অটুট থাকে। কিন্তু চিকিৎসকের ব্যবস্থামতো যথাযথ চিকিৎসা না হলে এই সামর্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে রাতের কাজ থেকে দিনের কাজে সাময়িক বদলি করা, হৈ-হল্লার কাজ থেকে, স্নায়ুর উপর বেশী চাপ সৃষ্টিকারী কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন।

স্নায়ুবিকার রোধের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন মানসিক আঘাতের সকল হেতু, সবসময়ের অস্বস্তি, উদ্বেগ ও বিরক্তি ইত্যাকার যেসব কারণ স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে সেগুলি দূর করা। ইচ্ছাশক্তির চর্চা, সহনশীলতা, আত্মসংযম এবং ফলপ্রসূ কাজে অংশ গ্রহণ স্নায়ুবিকাররোধে সাহায্য করে।

উপযুক্ত কাজ ও বিশ্রামের নিয়ম, যথেষ্ট ঘুম ও উপযুক্ত খাদ্য এর সবই অত্যন্ত জরুরি। মদ খাওয়া চলতে পারে মাঝেমধ্যে এবং সম্ভব হলে পুরোপুরি বর্জনীয়। অতিরিক্ত যৌনসঙ্গম পরিত্যাজ্য। ধূমপান অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে, বিশেষত রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করলে, হৃৎস্পন্দনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে।

যারা কেবল মানসিক পরিশ্রম করে তাদের জন্য এক্ষেত্রে শরীরচর্চা ও খেলাধুলা প্রয়োজন।

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপের প্রধান লক্ষণ হল ক্ষুদ্র ধমনীগুলির সঙ্কোচনজাত উচ্চ ধমনী-চাপ।

বহু লোক তাদের ধমনীচাপের জন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। আর এই উদ্বেগই তাদের রক্তচাপ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। এইসব রোগীদের একথা

জানা ভাল যে, উচ্চ ধমনীচাপ সবসময়ই গুরুতর অসুখ বোঝায় না। কেননা, অনেকসময় তা এমন সব লোকের মধ্যে দেখা যায় যাদের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।

কোন কোন অবস্থায়, যেমন উত্তেজনার মুহূর্তে, দৌড়ের সময় অথবা শীতে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকা ইত্যাদিতে বিশেষ স্বাস্থ্যবান লোকের মধ্যেও সাময়িক উচ্চ ধমনীচাপ দেখা যায় যা তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে আসে। এমনও দেখা গেছে (চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার সময়) যে কিছু কিছু রোগীর রক্তচাপ সহজেই 'লাফ দিয়ে' বেড়ে যায় এবং অধিকাংশ লোকের মধ্যে যা দেখা যায় তার চেয়ে অধিকতর সময় এই চাপ উচ্চস্তরে থাকে। এইসব লোক অসুস্থ বলে বিবেচিত হতে পারেনা। কিন্তু, একই অবস্থায় তারা অন্যদের চেয়ে সহজে এবং তাড়াতাড়ি উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু 'স্নায়ুবিকার প্রতিরোধ' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি যথাসময়ে গ্রহণ করলে রোগটি সেরে যেতে পারে। এইসব ব্যবস্থা যথাসময়ে গ্রহণ না করলে প্রতিকূল অবস্থায় রোগবৃদ্ধি সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে ধমনীচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে কদাচিত। যদিও রোগী কিছুসময় শয্যাগত থাকলে চাপটি আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে। রোগের এই পর্যায়ে রোগীর অভিযোগ খুব কমই থাকে: সামান্য মাথাধরা, কম ঘুম, বুকধড়ফড়ানি এবং বুকের এলাকায় আরও কিছু অস্বস্তিকর অনুভূতি। শুধু উচ্চ রক্তচাপেই নয়, অত্যধিক উত্তেজনাপ্রবন লোকেরাও এই ধরনের অভিযোগ করে থাকে।

রোগীকে পরীক্ষা করে চিকিৎসক হৃৎপিন্ড অথবা রক্তনালীতে কোন পরিবর্তন না দেখলে এটাকে শরীরের কোন ক্ষত সৃষ্টির পূর্বাভাস ধরতে হবে। এই অবস্থায় তা হবে ধামনিক চাপের ব্যাপক তারতম্যের প্রবনতাযুক্ত স্নায়ুবিকার মাত্র।

রোগ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ধমনীচাপও অনেকক্ষন পর্যন্ত উচ্চস্তরে থাকবে এবং পরবর্তী অবস্থায় ধমনীকাঠিন্যজনিত বিভিন্ন কারণে উচ্চ রক্তচাপের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে ও হৃৎপিন্ডেও হয়ত পরিবর্তন দেখা দেবে।

কিন্তু হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীতে ক্ষত হলেও স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাবলে শরীর এই নতুন অবস্থার সঙ্গেও মানিয়ে নিতে পারে। বহু রোগীর রোগের এই অবস্থায়ও পুরো সামর্থ্য অটুট থাকে।

কিজন্য উচ্চ রক্তচাপ জন্মে ও বৃদ্ধি পায়? কিজন্য ক্ষুদ্র ধমনীগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী আক্ষেপের সৃষ্টি হয় যেজন্য উচ্চ ধমনীচাপ দেখা দেয়?

উচ্চ ধমনীচাপের অনেক কারণই আমরা এখন জানি। যেমন, কিছু অন্তস্রাবী গ্রন্থি এমন পদার্থ সৃষ্টি করে যা রক্তনালীগুলির সঙ্কোচন ঘটায় যাতে ধমনীচাপ বৃদ্ধি পায়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিন্যালিন এবং হাইপোপাইসিস থেকে নিঃসৃত হাইপাকাইসিন (পিটুট্রিন) সম্পর্কে তা সত্য। গ্রন্থিগুলির কিছু রোগের সঙ্গে উচ্চ ধমনীচাপ যুক্ত থাকে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে রক্তচাপ, উচ্চ ধমনীচাপ কোন আলাদা রোগ নয়।

অনুরূপভাবে কিডনির অনেক রোগে, বিশেষত এগুলির তীব্র ও ক্রনিক প্রদাহে (নেফ্রাইটিস) যথানিয়মে উচ্চ ধমনীচাপ দেখা দেয়। এটা ঘটে এজন্য যে অসুস্থ কিডনি থেকে নিঃসৃত একটি বিশেষ পদার্থ শরীরে বিদ্যমান অন্যান্য কিছু পদার্থের সঙ্গে মিশে ধমনীতে আক্ষেপ সৃষ্টি করে এবং ফলত উচ্চ ধমনীচাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিডনিগত তথাকথিত উচ্চ রক্তচাপও যথার্থ উচ্চ রক্তচাপ হিসাবে গন্য হয়না, যদিও রোগগুলি কিছুটা পরস্পরযুক্ত: উচ্চ রক্তচাপের প্রাগ্রসর অবস্থায় কিডনিগত ধমনীগুলিতে কাঠিন্য দেখা দিলে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে এবং স্পষ্টতই কিডনিগত উচ্চ রক্তচাপ মূল রোগের সাথে যুক্ত হওয়ার দরুণ তার ধমনীর রক্তচাপ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু কিডনিগত উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্তস্রাবী গ্রন্থির রোগজনিত উচ্চরক্তচাপ 10% রোগীর ক্ষেত্রেই শুধু দেখা যায়, বাদবাকি 90%-এর ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণ থাকে।

এটা সত্য বলে ধরে নেয়া যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রোগ বুদ্ধিবৃত্তিগত অতিরিক্ত চাপ ও দুঃখদুর্দশা ও মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অত্যধিক উত্তেজনা থেকে সৃষ্টি হয়। গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগ ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের নিম্নাংশ—যেখানে নিয়ামক স্নায়ুকেন্দ্রগুলির অবস্থান — তার উপর থেকে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলত তথাকথিত জড় উত্তেজনার একটা কেন্দ্র গঠিত হয়, অর্থাৎ যে-উত্তেজনা নিষ্ক্রান্ত হওয়ার 'পথ' পায়না এবং যথাসময়ে নিরোধক দ্বারাও প্রতিস্থাপিত হয়না। এ থেকেই স্নায়ুবিকার জন্মে, নিয়ামক স্নায়ুকেন্দ্রের

স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে এবং ফলশ্রুতি হিসেবে ধমনীর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতিভোজন এবং খাদ্যে কলেস্টেরলসমৃদ্ধ উপাদানের আধিক্য এক্ষেত্রে রোগ শুরু ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং বিশেষত ধমনীকাঠিন্য-এর প্রকোপ বাড়ায়।

সন্দেহ নেই, জলাবায়ুর পরিস্থিতি ও আবহগত চাপ ধমনীচাপকে প্রভাবিত করে। যেসকল আবহাঞ্চলে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ, গরম ও শুষ্ক আর শীতকাল স্বল্পস্থায়ী এবং বায়ুচাপ প্রায় পারদের 715-730 মি. মি. — যেমন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্থানের রাজধানী তাশখন্দ — সেখানে জ. উমিদভা'র মতে দেশের অন্যান্য রোগের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের হার মাত্র 4.2%, করোনারি দৌর্বল্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগের (শ্বাসার্তিহৃৎশূল, হৃৎপেশীভঙ্গ) ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। কিন্তু তাশখন্দের অদূরবর্তী 'কারাগান্দা'য় অবস্থাটি সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানকার আবহাওয়া, আর্দ্রতা হল মহাদেশীয়, কিন্তু বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি, প্রায়শই প্রবল বাতাস বয় এবং চাপমানযন্ত্রে বায়ুচাপ প্রায়ই পারদের 700 মি. মি.: বা তারও নিচে থাকে সেখানে উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগীর সংখ্যা 22.4%, তাশখন্দের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি।

উচ্চ রক্তচাপ ও তা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রক্রিয়ার এই ধারণাই হল এই রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণের মূলভিত্তি।

সর্বপ্রকার রোগ প্রতিরোধের — বিশেষত যেখানে উচ্চতর স্নায়বিক কাজের বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত ভূমিকাসীন — ভিত্তি হল জীবনযাত্রা ও কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, শরীরচর্চা এবং অন্যান্য উপায়ে শরীরকে সুগঠিত ও মজবুত করা।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে উচ্চ রক্তচাপ সনাক্ত করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে কিছু লোকের চরম উত্তেজনার ঝোঁক থাকে, তাদের দ্বন্দ্বগুলি তারা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে পারেনা, উত্তেজনার জেরগুলি তারা বহুদিন ধরে রাখে। এদের রক্তচাপ মাপলে দেখা যাবে যে শান্ত পরিবেশেও তাদের রক্তচাপ কিছুটা বেশি থাকে। এইসব লোককে ডাক্তারী পরীক্ষার আওতায় রেখে তাদের জন্য সম্ভাব্য শ্রেষ্টতম জীবনযাপন পদ্ধতি ও কাজের ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন, তারা যদি রাতে কাজ করে তবে তাদের দিনের কাজে বদলি করতে হবে।

অসংখ্য পর্যবেক্ষণের থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে যেসব লোক কঠিন বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজে নিযুক্ত, অধিক সময় বসে কাজ করে ও যাদের শরীর ভারী হয়ে থাকে, তাদের প্রায়ই উচ্চ রক্তচাপ রোগ জন্মে এবং এই রোগ থেকে দ্রুত ধমনীকাঠিন্য দেখা দেয়। নিয়মিত দৈনিক দুঘণ্টা বাইরে ভ্রমণ, যুবক ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে শরীরচর্চা, অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার, মিষ্টি ও শ্বেতসারপূর্ণ খাবার কম খাওয়া স্থূলত্বপ্রবণ লোকদের উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ ও সফল চিকিৎসায় বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ধূমপানে রক্তনালীতে অনৈচ্ছিক আক্ষেপ সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে তা ছেড়ে দেয়াই ভাল। নতুবা নিদেনপক্ষে তা কমাতে হবে। যাদের হাতের বা পায়ের আঙ্গুল অসাড় বা ঠান্ডা হয়ে যায় ও বুকে ব্যথা আছে তাদের পক্ষে ধূমপান একেবারেই ছেড়ে দেয়া উচিত। মদ্যপানও তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা, মদ স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল রোগীকে প্রশান্ত রাখা এবং মস্তিষ্ককে 'বিশ্রাম' দেয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা।

শ্রম ও বিশ্রামের একটি উপযুক্ত বিধির উপরই আসলে চিকিৎসার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। কোন কোন সময় ধমনীর রক্তচাপে স্বাভাবিক করা এবং রোগীর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এটাই যথেষ্ট।

ব্যাপকতম অর্থে মনসমীক্ষণ খুব উপকারী: এতে থাকে প্রথমত প্রশান্তিকর পরিবেশের প্রভাব এবং আত্মীয় ও বন্ধুদের দেয়া উৎসাহ। কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দেয়া নিয়মিত অভিভাব ও সম্মোহনে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা পাওয়া যেতে পারে স্বাস্থ্যনিবাসে। উপযুক্ত 'রক্ষামূলক বিধি' সৃষ্টি — রোগীর মনের শান্তিরক্ষার জন্য নৈশব্দ্যের ব্যবস্থা ও উত্তেজনার প্রত্যেকটি কারণ দূর করা — অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ দৈহিক বিশ্রাম দিতে হবে, অর্থাৎ তাকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বিছানায় রাখা উচিত নয়। মনে রাখা প্রয়োজন, আলসেমি অনেক রোগীকে (কাজ যাদের অভ্যাস, কাজ ও কাজের সঙ্গীরা খুবই পছন্দসই) দুর্বল করে তোলে এবং কাজে ফিরে গেলেই তারা সুস্থ বোধ করে।

ব্রোমাইড্স্, ভ্যালেরিয়ান ও অন্যান্য কিছু ওষুধ ডাক্তারের

নির্দেশমতো খেলে রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। এতে যথেষ্ট ঘুম নিশ্চিত হয় এবং ধমনীচাপ কমে।

ঘুম হল রক্ষামূলক নিরোধ, অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগের স্নায়ুকোষগুলির ক্ষতিকর অত্যধিক উত্তেজনা নিবারক। অতএব যথেষ্ট দীর্ঘ এবং গভীর ঘুম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু ক্লিনিক ও হাসপাতাল অবিরাম ঘুমের সাহায্যে চিকিৎসা করে।

ডাক্তারের বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাবার হবে রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য, রোগের পরিস্থিতি, হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের অবস্থা, মোটা হওয়ার প্রবনতা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিশীল। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের মধ্যে প্রাথমিক এবং দ্রুত বর্ধমান ধমনীকাঠিন্যের প্রবনতা থাকার প্রেক্ষিতে তাদের ধমনীকাঠিন্য ও ওজনবৃদ্ধি রোধী খাবার খাওয়া উচিত।

কোন কোন ক্ষেত্রে (প্রায়ই ওজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে) তথাকিথত উপবাস বিধেয়।

ভৌতচিকিৎসা, প্রধানত জলচিকিৎসা (ইষদুষ্ণ জলস্নান, র‍্যাপিং) স্নায়ুর পক্ষে প্রশান্তিকর বিধায় খুবই উপকারী। তড়িৎচিকিৎসাও বহুল প্রচলিত।

অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপে চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম যথেষ্ট উপকারী। এই রোগের জন্য উচ্চ ধমনীচাপ, কঠিন মানসিক শ্রম এবং ঋণাত্মক আবেগই (দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ) শুধু নয়, কম কায়িক শ্রমও দায়ী। তাই শরীরচর্চা উচ্চ রক্তচাপ রোধের সহায়ক এবং আনুষঙ্গিক একটি চিকিৎসাও।

শরীরচর্চায় (অল্প পরিমাণে) রক্তে রক্তবাহ প্রসারক পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটি ক্ষুদ্র ধমনীপ্রাচীরের পেশীগুলির প্রসারনিয়ন্ত্রক স্নায়বিক ও জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াগুলির সমন্বয় উন্নয়নে সহায়তা যোগায়।

ক্ষেত্রবিশেষে মাথার ম্যাসেজে মাথাব্যথা সারে ও প্রতিবর্তক্রিয়া হিসাবে ধমনীচাপেও হ্রাস পায়।

অনেক সময় ধমনীর রক্তচাপ কমাতে ওষুধ গ্রহণ সুবিধাজনক। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকে তা অনুচিত।

অনেক রোগী উচ্চ রক্তচাপের স্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু, তাদের একটা নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী থাকা প্রয়োজন: কাজের পরে যথেষ্ট বিশ্রাম এবং রোগের প্রকোপ এড়ানোর জন্য ডাক্তারের

উপদেশ মতো চলা। চিকিৎসকরা কখনো কখনো রোগীর পরিবর্তন অথবা সাময়িক কর্মবিরতি অনুমোদন করেন।

কর্মক্ষমতা অটুট রাখা অনেকটাই নির্ভর করে উপযুক্ত পেশানির্বাচন এবং রোগীর নিজস্ব অনুভূতির উপর। এমনকি, উচ্চ রক্তচাপ কিছুটা কায়েম হয়ে গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই রোগ নিরাময় কিংবা অন্তত তার কর্মক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে তাকে আনা অবশ্যই সম্ভব। সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, অতিসংবেদী ব্যক্তিরা এসম্পর্কে সাবধান থাকবে। কেননা, তারা তাদের অসুবিধাকে বাড়িয়ে তোলে ও ভিত্তিহীন ভয়কে লালন করে। কেবল ডাক্তার নন, রোগীর আশপাশের লোকদেরও উচিত রোগীকে আশাবাদী করে তোলা। রোগীর নিজেরই শান্তভাব এবং আত্মসংযমে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। কারণ চিকিৎসায় সেগুলি অবদান রাখে ও রোগের প্রকোপ নিরাময়ে সাহায্য দেয়। সুস্থ আশাবাদ উচ্চ রক্তচাপের সর্বোত্তম ওষুধ।

ধমনীস্থূলতা

ধমনীগুলির প্রাচীর শক্ত হয়ে ওঠাই হল ধমনীস্থূলতা এবং এতে ধমনীগুলির আবরণে সাধারণত অনুপস্থিত কিছু কিছু পদার্থের তলানি জমে। যেমন: ক্যালসিয়াম, কোলেস্টারাল, এবং হায়ালিন (প্রোটিন জাতীয় পদার্থ)। প্রধানত, কোলেস্টারাল চাপড়ার ন্যায় ও পরবর্তীতে মন্ডাকারে জীবনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, মহাধমনী এবং হৃৎপিন্ড ও মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলিতে জমা হয়। এজন্যই রোগটির নাম ধমনীস্থূলতা। এটি হল ধমনীকাঠিন্যের সহজলভ্যতম একটি রূপ।

কঠিন ধমনী সঙ্কুচিত হয় এবং কখনো কখনো রক্তপিন্ড এটির ভেতরের আস্তরে জমা হয়, যেখানে কলেস্টেরলের চাপড়া অবস্থিত থাকে। এভাবে ধমনীর গহ্বর বন্ধ হয়ে গিয়ে দেহের বিশেষ অংশে রক্তসরবরাহ থেমে যেতে পারে। পরিবর্তিত ধমনীতে দুর্বল উত্তেজকের প্রভাবে (শীতে) সহজেই প্রচন্ড অক্ষেপ ঘটে এবং তা ধমনীগহ্বর আটকে দিতে সহায়তা যোগায়।

ধমনীর স্থূলত্ব প্রায়ই সমানভাবে ঘটেনা। কখনো তা কেবল মহাধমনী, কখন-বা তা মস্তিষ্কের রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কঠিন ধমনী যে-সকল

প্রত্যঙ্গে পুষ্টি সরবরাহ করে প্রধানত সেগুলির পুষ্টির বিশৃঙ্খলার ধরনের মধ্যেই এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়।

একটি কঠিন মহাধমনী অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক ও কিছুটা কম প্রসারিত হয়। অবস্থাটি ঘাতশ্রুতি ও এক্সরের সাহায্যে সনাক্ত করা যায়। কেবল মহাধমনীতে কাঠিন্য সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থায় রোগী কোন অস্বস্তি বোধ করেনা বা শরীরে কোন বড় রকমের বিশৃঙ্খলাও দেখা দেয় না। কিন্তু প্রক্রিয়াটি মহাধমনীর কপাটিকাকে জড়ালে কপাটিকা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং হৃৎপিণ্ড বিস্তারের সময় মহাধমনীর মুখ বন্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা লোপ পায়। ফলত, মহাধমনীর রক্তাল্পতা নামক রোগটি জন্মে। কপাটিকার কাঠিন্যজনিত হৃৎনিষ্ক্রিয়া থেকে সাধারণত রক্তসঞ্চালনের অপ্রতুলতা দেখা দেয় না।

করোনারি ধমনীর কাঠিন্য তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এতে শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের আক্রমণ বৃদ্ধি পায় এবং কখনো হৃৎপেশীভঙ্গও ঘটে।

গুরুমস্তিষ্ক ও হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের অন্যান্য অংশের কাঠিন্য প্রথমে ধমনীগুলির আক্ষেপ বা প্রসারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। রোগীরা রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করে। কখনো কখনো তাদের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ও মাথাধরে। রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকলে অবস্থাটি স্থায়ী হয়ে ওঠে, স্মৃতিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রোগী মানসিক কাজে অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, স্বভাব খিটখিটে হতে থাকে এবং গুরুমস্তিষ্কের কাজে অন্যান্য বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

পায়ের ধমনীকাঠিন্য থেকে তথাকথিত সবিরাম পঙ্গুত্ব জন্মে। রোগটি প্রথমে ঘোড়ার মধ্যে ধরা পড়েছিল এবং পশুচিকিৎসকরা তা বর্ণনা করেছিলেন। পূর্ণ বেগে দৌড়ানোর সময় শিরাকাঠিন্যের জন্য অপুষ্টিজনিত কারণে ঘোড়ার গেস্ট্রোনেমিয়াস পেশীর খিল ধরে যায় এবং ঘোড়া রুগ্ন পা গুটিয়ে তিন পায়ে দৌড়ুতে থাকে, যতক্ষন রুগ্ন পা নাড়ান সম্ভব না হয়। মানুষও এই একই রোগে ভোগে। এই রোগে সাধারণত একটি পা আক্রান্ত হয় ও সে আনুষঙ্গিক ব্যথা অনুভব করে। রোগী প্রথমে খোঁড়াতে থাকে, কিন্তু 'খিলধরা' সেরে গেলেই চলার শক্তি ফিরে পায়। রোগটা সেরে না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু ব্যথা ও পঙ্গুত্ব অচিরেই ফিরে আসে।

ঘটনাগুলি সবসময়ই কিন্তু ধমনীকাঠিন্য বুঝায় না। কোন রক্তনালীর

আক্ষেপের জন্যও এমনটি ঘটতে পারে যা ধূমপায়ীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়। ধূমপান ছেড়ে দিলেই রোগী এই কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

পায়ের ধমনীকাঠিন্যে আক্ষেপের প্রবনতা বেড়ে যায়। গোড়ার দিকে রোগটি শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের মতোই মনে হয়, যাকে কখনো কখনো 'হৃৎপিণ্ডের সবিরাম পঙ্গুত্ব' বলা হয়ে থাকে। এইসব রোগীদের পাগুলি সব সময় গরম রাখা এবং শীতে গরম মোজা, গরম অন্তর্বাস, গরম জুতা ইত্যাদি পরা উচিত।

হাঁটার সময় এদের সঠিকভাবে তবে ধীরে ধীরে চলা উচিত। পায়ের ধমনীকাঠিন্যের পরিণত অবস্থায় অস্ত্রচিকিৎসা প্রয়োজন।

সাধারণত হাতের ধমনীকাঠিন্য পায়ের ধমনীকাঠিন্যের মতো ততটা গুরুতর হয় না। নাড়ী দেখে তা সহজেই সনাক্ত করা যায়। কনুইয়ের ধমনী স্পর্শ করলে স্বাভাবিকের চেয়ে তা শক্ত মনে হয় এবং কখনো কখনো তাতে খাঁজ দেখা যায়।

কপালপাশের ধমনীর অস্বাভাবিক কুটিলগতি ধমনীকাঠিন্যেরই পূর্বাভাস। চোখের ভিতর আলোকিত করার অক্ষিবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে চোখের ভিতরের ধমনীগুলির কাঠিন্য প্রাথমিক অবস্থায়ই, যেমন উচ্চ রক্তচাপ রোগে, লক্ষ্য করা যায়।

উদরের ধমনীকাঠিন্যে পরিপক্ক অবস্থায় শ্বাসার্তিহৃৎশূলের মতোই মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা অনুভূত হয়।

ধমনীস্থূলতার কারণ কি? কোন কোন হেতু এই রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা যোগায়? আগে মনে করা হত শিরাগুলির বয়স যেহেতু মানুষের বয়সের সমান তাই ধমনীকাঠিন্য খোদ বয়স্কতারই রোগ। এটা কেবল আংশিক সত্য। যৌবনের চেয়ে মধ্যবয়সেই রোগটির প্রকোপ বেশি ঘটে। কিন্তু একদিকে অনেক বৃদ্ধের মধ্যেও ধমনীস্থূলতার স্পষ্ট লক্ষণ থাকে না। আবার অপরদিকে অনেক অল্পবয়স্কের মধ্যেও রোগটি দেখা যায়।

পুরুষরা প্রায়ই স্ত্রীলোকের চেয়ে অল্পবয়সে এই রোগে আক্রান্ত হয়। সম্ভবত স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষদের অধিক ধূমপান ও মদ্যপানই এর কারণ।

মদের অপব্যবহার উচ্চতর স্নায়বিকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায় এবং সেজন্য

কলেষ্টেরল সহ যাবতীয় বিপাক-নিয়ন্ত্রক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমেই মূলত ধমনীর স্থূলতাবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

আকাদিমিশিয়ান ন. আনিচকভের তত্ত্ব অনুযায়ী কলেস্টরল-বিপাকের বিশৃঙ্খলার দরুনই রক্তনালীর প্রাচীরে কলেস্টরেল জমা হতে থাকে এবং এটাই ধমনীস্থূলতার মূল কারণ। কলেষ্টেরল-বিপাকে বিঘ্ন দেখা দিলে কলেষ্টেরলপূর্ণ খাবার ধমনীস্থূলতায় ইন্ধন যোগায়। আলস্যে দেহের ওজন বাড়ে এবং অকালে ধমনীস্থূলতা দেখা দেয়।

ধমনীস্থূলতা রোধের জন্য সবিশেষ প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য, কর্মময় জীবন এবং স্নায়ুর পক্ষে ক্লান্তিদায়ক যাবতীয় কারণ পরিহার। ধমনীস্থূলতা বা এই রোগবৃদ্ধিরোধী খাবার সম্পর্কে 'খাদ্য তালিকা' অধ্যায়েই সবকিছু বলা হয়েছে।

বিশেষ জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে কলেষ্টেরলসমৃদ্ধ খাবারই শুধু ধমনীস্থূলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয় না, সাধারণত অতিভোজনও এ জন্য দায়ী। কেননা, প্রোটিন ও শর্করাসমৃদ্ধ খাদ্য থেকেও কলেষ্টেরল উৎপন্ন হতে পারে। উপরন্তু, ইদানীংকার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে অনেক লোক কলেস্টরলসমৃদ্ধ যথেষ্ট খাবার খেয়েও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্য বজায় রেখেছে। পক্ষান্তরে, এমন ঘটনা জানা গেছে, কেউ কেউ সবসময় কলেষ্টেরলসমৃদ্ধ খাদ্য এড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অল্পবয়সে ধমনী-স্থূলতায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলত, প্রতিপন্ন হয় যে, কলেষ্টেরলের প্রাচুর্যই শুধু এজন্য দায়ী নয়। বিশেষত, কিছুলোকের জন্য যুক্তিসঙ্গত খাদ্যতালিকার রোগবারক ভূমিকার কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন।

45-50 বছরের ঊর্ধ্ববয়সীদের মধ্যেই ধমনীকাঠিন্যের আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং রোগটি বয়সের সঙ্গে অর্থাৎ, রক্তনালীর আবরণীর ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গেও অংশত যুক্ত। কিন্তু, খাদ্যব্যবস্থা সহ দীর্ঘদিন ও ক্রমাগত স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনই এর প্রধান কারণ। ধমনীকাঠিন্য বৃদ্ধবয়সের একান্ত অপরিহার্য সঙ্গী নয়। এটিও একটি রোগ এবং এর চিকিৎসা সম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রোগটিকে ঠেকান, তার বৃদ্ধি আটকে রাখা।

তরল পদার্থ পান সীমিত করা চলবে না। বরঞ্চ রোগীকে তরল খাদ্য, চা, দুধ ইত্যাদি সহ দৈনিক 5.1 লিটার জলীয় পদার্থ পান করতে হবে। তরল পদার্থ খুব কম খেলে রক্ত ও শরীরের অন্যান্য রস কিছুটা ঘন

হয়ে যায়, অঢেল বিপাকীয় দ্রব্য পুঞ্জিভূত হতে থাকে এবং বিপাকক্রিয়ার পরিস্থিতিতে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। খাবারে বেশি লবণ থাকলে তরলপদার্থ শরীরে প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় আটকে থাকে। জারান খাবার খুব কমই খাওয়া উচিত। দুধ এবং শাকসবজির সুপ বাঞ্ছনীয়।

কর্মময় জীবন এবং শরীরচর্চা এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যপ্রদ। কারণ, এতে বিপাকক্রিয়ায় উন্নতি ঘটে ও পুরো শরীরের, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানসিক শ্রমরতদের জন্য শরীরচর্চা বিশেষভাবে প্রয়োজন। পেশাগত কাজে যাদের কিছুটা কায়িক শ্রম প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

যুবক ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্য শরীরচর্চা প্রয়োজনীয় বিধায় তা নানাভাবে সারাজীবন চালিয়ে যাওয়া উচিত।

40 বছরের বেশী বয়সে অনেকেই শরীরচর্চা ছেড়ে দেয়। কিন্তু, তা অনুমোদনীয় নয়। এই সময় মানুষ মোটা হতে থাকে এবং নড়াচড়া করতে বা অনেকক্ষণ কায়িক শ্রমে কষ্ট বোধ করে। তাই বলা বাহুল্য এই বয়সেই শরীরচর্চা সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

রক্তনালীগুলির কাঠিন্য ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত একজন মধ্যবয়সীর জন্য কী ধরনের শরীরচর্চা অনুমোদনীয়? সকলের উপযোগী সাধারণ কোন বিধি অনুমোদন অসম্ভব বটে। এজন্য প্রত্যেকের নিজস্ব চিকিৎসক এবং শরীরচর্চা বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। এখানে কেবল এটুকুই বলা চলে যে ভোরের কিছু ব্যায়াম ও খেলাধুলা সকল বয়সেই উপকারী। অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে শরীরচর্চা বাধাগ্রস্ত হলে এই বাধ্যতামূলক বিরতির পর পুনরায় শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সময় ধীরেসুস্থে প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত।

শরীরচর্চা, রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান ও পথ্য নির্বাচনের মাধ্যমে চিকিৎসক তাঁর রোগীকে ধমনীকাঠিন্য থেকে নিরাপদ রাখতে, রোগের বৃদ্ধি থামাতে এবং রোগের কুফলগুলি সারাতে বা কমাতে পারেন। অবশ্য এরকম সাফল্যের জন্য চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই আত্যন্তিক ধৈর্য ও আত্মসংযমের প্রয়োজন।

একটি প্রচলিত জনপ্রিয় বিশ্বাস এই যে মধ্যবয়সীদের (40-50 বছর বয়সী) ধমনীকাঠিন্য রোধের জন্য মাঝে মধ্যে আয়োডিন খাওয়া ভাল।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া একাজে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি ঘটতে পারে। অনেকে আয়োডিন সহ্য করতে পারেন এবং ফলত প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের সর্দিকাশি, অতিসার ও গায়ে ফুসকুড়ি দেখা দেয়। তদুপরি বহুদিন আয়োডিন খেলে স্নায়ুতন্ত্র অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়। বিশেষত স্ত্রীলোকদের ঋতুজরার সময় অধিকমাত্রায় আয়োডিন খেলে বেসড্র রোগ (অস্বাভাবিক চওড়া চোখ, বুকধড়ফড়ানি, সাধারণ স্নায়ুবিকার ও থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি ইত্যাদি) দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে বেসড্র রোগের চিকিৎসায় অত্যল্প মাত্রায় আয়োডিন গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। কারণ, এক্ষত্রে আয়োডিন স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা প্রশমিত করে। গুরুমস্তিষ্কের কোন কোন ধমনীকাঠিন্যের চিকিৎসায় চিকিৎসকরা অলপ মাত্রায় আয়োডিন খাওয়ার বিধান দেন।

ডাক্তাররা ধমনীকাঠিন্য রোধ বা সারানের জন্য মধ্যম মাত্রায় আয়োডিন বা সিয়োডিন (দিনে 1-2 বড়ি) বিশেষত গ্রীষ্মকালে খাওয়ার বিধান দেন।

আহারের পর আয়োডিন খাওয়া এবং দুধ ও ক্ষারজলে তা ধুয়ে ফেলাই সবচেয়ে ভাল (এক গ্লাস খনিজ জলের তিন-চতুর্থাংশ)।

উপসংহারে বলা উচিত যে মদ্যপান ও ধূমপানের মাত্রা কমালে ধমনীকাঠিন্যের বিপদ কমান যায়।

নিম্নোক্ত দুটি রোগের একটি অভিন্ন লক্ষণ আছে। সেগুলি হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে রক্তসরবরাহে সুস্পষ্ট ব্যর্থতার (তীব্র করোনারি রক্তাল্পতা) সঙ্গে যুক্ত। হৃৎপিণ্ড-পেশীর রক্তসরবরাহের অপ্রতুলতা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে, তখন এই অবস্থাকে ক্রনিক করোনারি রক্তাল্পতা বলা হয়। করোনারি রক্তাল্পতার দুটি সবচেয়ে সহজলভ্য ও প্রকটিত ধরন — শ্বাসার্তি-হৃৎশূল ও হৃৎপেশীভঙ্গ।

শ্বাসার্তি-হৃৎশূল

শ্বাসার্তি-হৃৎশূল (স্টেনোকার্ডিয়া) হল উচ্চ রক্তচাপের মতোই একটি স্নায়ুবিকার। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর প্রলম্বিত অনৈচ্ছিক আক্ষেপ ও ধমনীর উচ্চ রক্তচাপের পরিবর্তে এই রোগে রক্তপ্রবাহ নিয়ামক স্নায়ুকেন্দ্রের কার্যকলাপ ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি

হৃৎপিন্ডের রক্তনালীগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্ষেপের মধ্যে প্রকটিত হয়। প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে, হৃৎপিন্ডের ধমনীগুলি অন্যান্য ধমনীর ন্যায় অনুবেদী স্নায়ুর বদলে ভেগাসের প্রভাবে সংকুচিত হয়। এইজন্য ভেগাসের অত্যধিক উত্তেজনা চিহ্নিত স্নায়ুবিকার পূর্বাহ্নেই শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের ইঙ্গিত দেয়।

শ্বাসকষ্ট এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এতে মাঝে মাঝে নানা তীব্রতা ও নানা স্থায়িত্বের ব্যথাও থাকে। অবশ্যই লক্ষণীয় যে বুকের ব্যথা মাত্রই শ্বাসার্তি-হৃৎশূল নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বুকব্যথার অন্যতর উৎস থাকে এবং তা সরাসরী হৃৎপিন্ডলগ্ন নয়। যেমন, বুকব্যথা অনেক সময় দেখা দেয় বক্ষস্নায়ুর একটি অসুখ, পঞ্জরমধ্য স্নায়ুশূলের জন্য। এক্ষেত্রে পঞ্জরাস্থির মধ্যে একটা আঙ্গুল চেপে ধরলে ব্যথা বাড়ে। পঞ্জরমধ্য ও অন্যান্য বক্ষপেশীর প্রদাহেও এই ধরনের ব্যথা দেখা দেয়। প্রায়ই মাংসপেশী ও স্নায়ু যুগপৎ আক্রান্ত হয় (নিউরোমায়োসাইটিস) অথবা অথবা মেরুদন্ডের স্নায়ুগুলির পশ্চাদমূলগুলিতে উত্তেজনা (র‍্যাডিকুলাইটিস) দেখা দেয়। এইসব রোগে বুকনাড়ান ও গভীর শ্বাস গ্রহণ খুবই কষ্টকর। শুষ্ক প্লুরিসি (প্লুরার অর্থাৎ ফুসফুস ও কন্ঠনালীর আবরনীর প্রদাহ) শুরু হলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় কখনো কখনো বুকব্যথা দেখা দেয়। বুকের ব্যথা, যার সঙ্গে হৃৎপিন্ড বা রক্তনালীর কোন সম্পর্ক নেই, তা স্নায়ুবিকারগ্রস্তদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই ব্যথা অন্যান্য রোগেও দেখা দিতে পারে। অতএব একজন ডাক্তারই কেবল রোগীপরীক্ষার পর এর কারণ বলতে পারেন।

শ্বাসার্তি-হৃৎশূল দৈহিক শ্রমের সময় এবং কোন বড় মানসিক আঘাতের পর দেখা দেয়। একে বলা হয় 'শ্রমের স্টেনোকার্ডিয়া'। রোগী উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার সময় কদাচিৎ ব্যথা দেখা দিলে একে বলা হয় বিশ্রামের স্টেনোকার্ডিয়া। কোন কোন সময় শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে ব্যথার বদলে থাকে শুধু একটা চাপের অনুভূতি। ব্যথা কখনো কখনো এত ক্ষণস্থায়ী হয় যে তা কয়েক সেকেন্ডমাত্র থাকে। অন্যান্য রোগীর ক্ষেত্রে তীব্রতর ব্যথা দেখা দেয়, কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় এবং হাতে ও স্কন্ধাস্থিতে ছড়ায়। আবার কখনো ব্যথা ঘাড়েও পোঁছায় (প্রায়ই বাঁ দিকে)। কিন্তু বুকব্যথা কখনো বাঁ হাত, ঘাড় ও গলায় ছড়ালেও একে শ্বাসার্তিহৃৎশূলে সংশ্লিষ্ট বলে ধরে নেওয়া উচিত হবে না।

কর্মরত অবস্থায় বা হাঁটতে থাকার সময় ব্যথা শুরু হলে ব্যথাজনিত সাধারণ দুর্বলতার জন্য রোগী কাজ বন্ধ করে দিতে এবং বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়। ব্যথা শেষ হয়ে গেলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠার ভাব ফিরে পায় এবং প্রায়ই তৎক্ষণাৎ বা সামান্য বিশ্রামের পর কাজে ফিরে যায়।

প্রচন্ড মানসিক আঘাতে স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রায়ই অধিক উত্তেজনা ও অতিরিক্ত চাপ পড়লেই কেবল শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে দেখা দেয়, যদিও তখন হৃৎপিন্ডের রক্তনালীগুলি স্বাভাবিকই থাকে। অল্পবয়সীরাই সাধারণত এতে আক্রান্ত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে যাদের হৃৎপিন্ডের রক্তবাহী ধমনীগুলি ধমনীকাঠিন্যের আক্রমণে কম-বেশি পরিবর্তিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরও শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে দেখা দিতে পারে। যেমন, দৈহিক শ্রম বা কষ্টকর কাজের সময় এই ধমনীগুলি ঠিকমতো ঢিলে হয় না, কখনো বা সংকুচিত হয়ে থাকে।

কোন কোন সময় চামড়া থেকে আসা উত্তেজক (ঠান্ডা বাতাসে) এবং পাকস্থলী (ভরা পেটে) থেকে আসা উত্তেজক প্রতিবর্তক্রিয়া হিসাবে হৃৎপিন্ডের রক্তবাহী ধমনীগুলিতে প্রচন্ড আক্ষেপ ঘটায় এবং ফলত শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে দেখা দিতে পারে।

কোন কোন বিষ, বিশেষত তামাকের নিকোটিন স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা ঘটিয়ে হৃৎপিন্ডে রক্তবাহী ধমনীগুলির স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ধূমপান এই রোগের একমাত্র না হলেও প্রধান কারণ। রোগের এই ধরনকে বলা হয় 'তামাক স্টেনোকার্ডিয়া'। অন্যান্য রোগীর বেলায় শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে অন্য কারণে জন্মালেও ধূমপান এর প্রকোপ বাড়িয়ে দেয় ও রোগটি আবিষ্কারে সাহায্য করে। মদ খাওয়াও শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের প্রকোপ বাড়ায়। তাই ধূমপানের মতো মদও এই রোগীর জন্য নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

নিম্নোক্ত যেসব কারণে শ্বাসার্তি-হৃৎশূল জন্মাতে পারে সেসম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে। যেমন: কোন সীমাহীন স্রোতের মত অসংখ্য গাড়ি বেগে ছুটছে এমন একটি চওড়া রাস্তা পার হওয়ার সময় বা কোন শ্বাসরুদ্ধকর জনাকীর্ণ থিয়েটার হলে প্রথম আক্রমণ ঘটলে এই ঘটনার শর্তাধীনে প্রতিবর্তক্রিয়া হিসাবে তা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে।

রোগী আবার নিজেকে অভিন্ন অবস্থায় দেখলে শর্তাধীন প্রতিবর্তক্রিয়ার অভিব্যক্তি হিসাবে পরবর্তী আক্রমণ ঘটাও সম্ভব।

মানুষের জীবনে কথার মূল্য যে কি অপরিসীম আমরা তা আগেই বলেছি। কোন লোককে তার রোগের ভয়ঙ্কর অবস্থা বর্ণনা করে তাকে ভয় দেখান এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের সহায়ক আশাবাদ থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব। একটি অপ্রিয় বিতর্ক, উদ্বেগজনক সংবাদ শ্বাসার্তি-হৃৎশূলকে ত্বরান্বিত করে।

অনেক ক্ষেত্রে রোগবৃদ্ধি উত্তেজকের শক্তির বদলে তার বারংবার পুনরাবৃত্তির উপরই নির্ভর করে। শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের উৎপত্তির সহায়ক কারণগুলি আমরা জানি। এগুলিই এই রোগ প্রতিরোধের উপযুক্ত চিকিৎসায় আমাদের সহায়তা যোগায়।

শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে প্রতিরোধে প্রথমত প্রয়োজন পুরো শরীরকে মজবুত করে গড়ে তোলা, দৈহিক ও মানসিক কাজের যথোপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে শরীরের সুসম উন্নয়ন ঘটান, স্কুলে ও বাড়িতে শিশু-কিশোরদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সকল বয়সে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার শরিক হওয়া। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজে বাধাদানকারী অপ্রিয় হেতুগুলিকে বাড়ি ও জীবিকা থেকে বর্জন খুবই প্রয়োজনীয়। শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে দেখা দেয়ার অন্যতর হেতু: শ্রম ও বিশ্রামের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা, সহজতর কাজ থেকে ক্রমান্বয়ে কঠিনতর কাজে যাওয়ার ব্যর্থতা, বহু লোকের সাথে মিলেমিশে সাধারণ কাজ করার অক্ষমতা, বিষাদগ্রস্ত অহঙ্কার, নিজ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা, অন্য কেউ কাজের ভুল ধরিয়ে দিলে নির্বিবাদে মেনে নিয়ে নিজেকে সংশোধন করার অপারগতা, ইত্যাদি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হৃৎপিন্ডের ধমনীকাঠিন্য শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের পথ সুগম করে। তাই ধমনীকাঠিন্য প্রতিরোধ করলেই শ্বাসার্তি-হৃৎশূলকেও ঠেকান যায়।

রোগের আক্রমণ ত্বরান্বিত করে এমন সব কাজ শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে রোগী অবশ্যই এড়িয়ে চলবে: ভরপেট খাওয়া, দ্রুত হাঁটা বিশেষত ঠান্ডা বাতাসে, ধূমপান ও মদ্যপান।

রোগীর কাজের অবস্থা প্রতিকূল হলে বা তার কাজে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক চাপ প্রয়োজন হলে পরিস্থিতিটি অবশ্যই বদলাতে হবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার পেশা সাময়িকভাবে এমনকি, স্থায়ীভাবে হলেও তা বদলান অনুমোদন করতে হবে। কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো 'কঠিনতর' কাজ ছেড়ে 'সহজতর' কাজ নেওয়া উচিত নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে রোগীর কাজ অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য হলেও নিজের অভ্যস্ত প্রিয় পেশায় সে কম চাপ অনুভব করে এবং নতুন সহজতর কাজ অচেনা বলে তার কাছে কঠিন মনে হয়। রোগীর জন্য পেশা নির্বাচনের সময় তা মনে রাখতে হবে। কেননা, পছন্দসই পেশা রোগীর জন্য ভাল ওষুধের কাজ করে। রোগীর কর্মস্থল তার বাড়ির কাছে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মনচিকিৎসা একটি মূল্যবান আরোগ্যমূলক ব্যবস্থা। আমরা আগেই বলেছি যে ঘুম একটি রক্ষাকারী নিরোধক। আরামদায়ক ঘুমের পর মস্তিষ্কের কোষগুলির কর্মক্ষমতা ফিরে আসে, সেগুলি বহিরাগত ও নানা প্রত্যঙ্গ থেকে আসা সকল উত্তেজনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে। অতএব, গভীর ও দীর্ঘ ঘুম (কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা) সুনিশ্চিত করতে হবে। কোন কোন সময় সম্মোহন বা স্নায়ুর উপর কার্যকর নিদ্রাকর ওষুধ (ব্রোমাইড, ব্রোমিউরাল, ভালেরিয়ান ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত। রোগীর উচ্চতর স্নায়বিক কাজের বৈচিত্র্যের সঙ্গে ওষুধের কার্যকরতা যুক্ত বিধায় কোন কোন সময় চিকিৎসকরা উপযুক্ত নিদ্রাকর ওষুধ বা সম্মোহন পছন্দ করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েন। ঘুমের আগে আধঘণ্টা বাইরে হাঁটা স্বাস্থ্যপ্রদ।

কোন কোন সময় শ্বাসার্তি-হৃৎশূলেও উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘনিদ্রার (দৈনিক 10-12 ঘণ্টা) চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়।

প্রধানত মানসিক কাজ পুরোপুরি বাদ দেয়া উচিত হবে না। স্মর্তব্য, শরীরের যাবতীয় প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ, বিশেষত স্নায়ুবিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুমস্তিষ্কের বহির্ভাগের উপযুক্ত সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল।

শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের আক্রমণ ঘটলে কি করা উচিত?

প্রথমত হৃৎপিন্ডের ধমনীগুলির তীব্র আক্ষেপ দূর করার সবকিছু করতে হবে। এজন্য রোগী সাধারণত ডাক্তারের পরামর্শে নাইট্রোগ্লিসারিন অথবা দ্রুত রক্তবাহপ্রসারক অন্য কোন ওষুধ খেয়ে থাকে। কয়েকমিনিট বা কয়েক সেকেন্ডর মধ্যেই ব্যথা থেমে যায়। ডিউরেটিন, ইউফিলিন, নাইট্রোপেনটন (এরিনাইট) ও অন্যান্য ওষুধ আরো ধীরে কাজ করলেও

সেগুলির রক্তনালী প্রসারণ ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়। দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়ার জন্য চিকিৎসকরা এইসব ওষুধেরই বিধান দিয়ে থাকেন।

কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের আক্রমণ ঘটে রাতে এবং এইসঙ্গে নাড়ীর স্পন্দন খুব নিচে নেমে যায় (মিনিটে 54-60 বার) অবস্থাটি ভেগাসের অত্যধিক উত্তেজনার ইঙ্গিত বহন করে। এইসব রোগীকে ডাক্তাররা নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে বেলাডোনা বা অ্যাট্রোপিনের বিধান দেয় যাতে ভেগাসের উত্তেজনা কমে। ওষুধগুলি নাড়ীর স্পন্দন বাড়ায় এবং হৃৎপিন্ডের ধমনীগুলির আক্ষেপ কমায়। শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের আক্রমণের সময় আন্ত্রিক পেশিগুলিতেও আক্ষেপ (পেটব্যথা) দেখা দিতে পারে। একই ওষুধে ওই আক্ষেপও দূর হয়।

শুয়ে থাকা অবস্থায় ভেগাসের উত্তেজনা বহাল থাকে। দাঁড়ান অবস্থায় অনুবেদী স্নায়ুর ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, নাড়ীর গতি ত্বরিত হয় এবং হৃৎপিন্ডের ধমনীগুলির আক্ষেপ থেমে যায়। কিছু রোগী নিজেরাই তা লক্ষ্য করে। রোগের রাত্রিকালীন ব্যথার আক্রমণের সময় তারা বিছানায় উঠে বসে ও পাগুলি ঝুলিয়ে দেয়। এভাবেই রোগী স্বস্তি পায়।

অনেক রোগী হাঁটার সময় শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে তাদের দ্রুত হাঁটা কখনোই উচিত নয়। কিংবা বলা যায় হৃৎপিন্ড যতটুকু জোরে হাঁটা অনুমোদন করে তার চেয়ে বেশি নয়। অর্থাৎ, হৃৎপিন্ডে ব্যথা না ওঠে এমনভাবে। অধিকন্তু তাদের কখনও মানসিকভাবে তাড়াহুড়া করা এবং দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য ভয় পাওয়া উচিত নয়। এই ধরনের রোগীদের হাতে কিছু সময় নিয়ে বাড়ি থেকে আগেই বেরোন উচিত।

এদের পক্ষে ভোরে খালিপেটে (পান ও আহার ছাড়া) কাজে যাওয়া এবং কাজে এসে ভোরের খাবার খাওয়া ভাল।

ব্যথা টের পাওয়া মাত্রই কাজ থামিয়ে নাইট্রোগ্লিসারিন (বড়ি বা ড্রপ) খেতে হবে। ব্যথা পুরোপুরি থেমে গেলেই কেবল সে হাঁটবে। কখনো কখনো এমনও ঘটে যে হাঁটা থামালেই ব্যথা কমে যায়, এমনকি নাইট্রোগ্লিসারিন না খেলেও।

নাইট্রোগ্লিসারিনে উপকার পেলে রোগীর বার বার তা খেতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারণ, ব্যথা থেমে গেলে হৃৎপিন্ডের কাজের জন্য সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়। নাইট্রোগ্লিসারিন খেলে অনেক রোগীর মাথা টিপটিপ

করে, এমনকি মাথাধরা রোগও হতে পারে। এজন্য ডাক্তাররা কম মাত্রায় নাইট্রোগ্লিসারিন, ভেলিডল বা অন্যান্য ওষুধের ব্যবস্থা দেন।

রোগীর পক্ষে উপযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। তাকে বার বার ও কম কম খেতে হবে এবং টেবিল ছেড়ে উঠার সময় যেন মনে হয় যে আরও কিছুটা খাওয়া যেত। খুব বেশি তরল পদার্থ খেলে পাকস্থলী অধিক ভারি হয়ে ওঠে।

যেসব খাদ্যে পেটে গ্যাস হয় (কপি, মটরশুঁটি, কাঁচাফল) সেগুলি বাদ দেয়া উচিত। মোটা লোক এবং মোটা হওয়ার প্রবনতাশীলদের খাদ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

গরম জল দিয়ে গা মোছা, পাইন পাতার নির্যাস স্নান, অন্যান্য ভৌত চিকিৎসা শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে ব্যবহৃত হয়।

গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখা (আধবালতি গরমজলে বড় চামচের এক চামচ সরষে) দীর্ঘ দিনের বুকব্যথায় খুবই উপকারী। পা জলে ডুবে থাকবে এবং জল হাঁটুর নীচ পর্যন্ত আসবে। 10-12 মিনিট হাতে ও স্কন্ধাস্থিগুলির মাঝখানের জায়গায় সরষের প্লাষ্টার যুগপৎ লাগাতে হবে। যথারীতি হাত ও পা গরম রাখতে হবে। ঠান্ডা হাত-পা এবং ভরাপেট এই রোগীর পক্ষে খুব ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্যনিবাসে থেকে চিকিৎসা করালে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, ঝোড়ো বাতাস নেই, তাপমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন হয়না, তেমন জায়গায় কোন স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসা করান ভাল। যেসব রোগীর কাজের সময় বা রাতে ব্যথা ওঠে তাদের পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়া উচিত নয়। অভ্যস্ত জলবায়ুতে থেকে চিকিৎসা করানই সবচেয়ে ভাল।

চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলি স্মর্তব্য। মৃদু ও ধীরে কায়িক শ্রমে রক্তনালী প্রসারক পদার্থগুলি তৈরি হয়। তাই এই পরিস্থিতিই হৃৎপিন্ডের রক্তসঞ্চালনের পক্ষে সুবিধাজনক। এজন্যই কোন কোন রোগী লক্ষ্য করে যে প্রথমে খুব আস্তে হাঁটলে তাদের বুকে ব্যথা হয়না এবং পরে ক্রমান্বয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিলে কায়িক শ্রমের সঙ্গে হৃৎপিন্ডের ধমনীগুলির একটা সমন্বয় গড়ে ওঠে। একজন যোগ্য ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থেকে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম

করলে রোগী ব্যথার আক্রমণ কমানোর বা উপশমের একটা পর্যায়ে পৌঁছতে পারে।

অক্সিজেন হৃৎপেশী, স্নায়ুতন্ত্র এবং সমস্ত শরীরের জন্য চমৎকার পুষ্টিকর উপাদান বিধায় বাইরে থাকা ও নিয়মিত বিশুদ্ধ অক্সিজেন সেবন শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে খুবই উপকারী।

দুরারোগ্য অবস্থায় স্বাভাবিক চিকিৎসায় কোন কাজ না হলে রোগীর জন্য কখনো কখনো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। হৃৎপিন্ডের রক্তনালীগুলির উপর এবং হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কার্যনিয়ামক অসংখ্য স্নায়বিক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রভাব ঘটানোর জন্যই তা করা হয় (নিচে দ্রষ্টব্য)।

উপযুক্ত চিকিৎসা এবং যোগ্য পেশানির্বাচন থেকে শ্বাসর্তি-হৃৎশূলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এমনকি মারাত্মক ও পৌনঃপুণিক ব্যথাও সম্পূর্ণ সেরে যেতে ও রোগীর কর্মদক্ষতা আবার ফিরে আসতে পারে।

হৃৎপেশীভঙ্গ

কোন করোনারি ধমনীর গহ্বরে বাধা সৃষ্টি হলে হৃৎপেশীভঙ্গ দেখা দেয় এবং ফলত হৃৎপেশীর (আয়োকার্ডিয়াম) এক অংশে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ও সেই অংশ হৃৎপিন্ডের কাজে শরিক হতে পারেনা।

রক্তসরবরাহ থেকে বঞ্চিত পেশীর সেই অংশটি ক্রমে ক্রমে নরম হয়ে ওঠে ও পরে সেখানে একটি ক্ষতচিহ্ন থেকে যায়। এই প্রক্রিয়ার প্রায় একমাস সময় লাগে, যখন বলা যায় 'স্থানীয়' ও শারীরস্থানিক নিরাময় ঘটে।

ছোটখাটো সীমিত পেশীভঙ্গ হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনশীলতার ক্ষতি ঘটাতে পারেনা। বড় ধরনের পেশীভঙ্গে ক্ষতচিহ্ন পেশীর বড় একটা অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলত, হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনশীলতা কিছুটা সীমিত হয়ে পড়ে। তথাপি, হৃৎপিন্ড অতঃপর বহুদিন ভালই কাজ চালিয়ে যায়। লক্ষণীয়, অসুখের প্রথম দিকে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে না রাখলে হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতা সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কেন করোনারি ধমনীগুলি আটকে যায়?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তনালীর গহ্বরগুলি জমাট রক্তে (থ্রম্বস) অবরুদ্ধ

হয়। এই রক্তপিন্ড তৈরির বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্রুত রক্ততঞ্চন, ধমনীপ্রাচীরের ভেতরের অংশের অবক্ষয়জনিত এবং রক্তপ্রবাহের ধীরগতি বা অবরুদ্ধ অবস্থা রক্তে অধিক মাত্রায় প্রথ্রম্বিন থাকলে রক্ততঞ্চনের সম্ভাবনা বাড়ে। প্রোটিন জাতীয় এই পদার্থটি রক্তের অনুচক্রিকায় দেখা যায়। রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ রক্তকণিকাগুলির মধ্যে ব্যাপক ঘর্ষণ (যেমন রক্তে রক্তকণিকার অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধি) ঘটলেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয়। দিনে রক্তের তঞ্চনসামর্থ্যের হেরফের ঘটে। অনুপোযোগী খাবার, বেশি পুষ্টিকর খাবার ও অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়ায় তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

ধমনীকাঠিন্যের ফলে প্রায়ই ধমনীপ্রাচীরের আভ্যন্তরীণ আস্তরে যথেষ্ট মসৃণতার অভাব ঘটে। ধমনীর কঠিন হয়ে ওঠা অংশের প্রাচীরে তখন রক্তজমাট দেখা দেয়। এভাবে ক্রমাগত বর্ধমান রক্তজমাট করোনারি ধমনীর গহ্বর আটকে দেয় এবং হৃৎপেশীভঙ্গ ঘটে।

ধমনীকাঠিন্যে সৃষ্টি ধমনীর আঙ্গিক সঙ্কোচনের সময় অথবা কোন ধমনীর স্নায়বিক আক্ষেপের সময় — যেমন শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে বা উচ্চ-রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে — রক্তপ্রবাহের গতিবেগ কমে আসে অথবা সাময়িকভাবে থেমে যায়। রোগী শুয়ে থাকলে, বিশেষত ঘুমের সময় রক্তপ্রবাহ যথানিয়মে ধীরে বহে, যখন করোনারি ধমনীর সঙ্কোচক হিসাবে ভেগাসের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

বাধা পাওয়ার সময় এবং সাময়িকভাবে রক্তপ্রবাহ বন্ধের সময় রক্তে দ্রবীভূত পদার্থগুলি সহজেই দ্রবণ থেকে তলানি হিসেবে নিচে পড়ে এবং রক্তজমাটের উপাদান হয়ে ওঠে।

ধমনীকাঠিন্য, শ্বাসার্তি-হৃৎশূলে, উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক লোকের মধ্যে পূর্বোক্ত কারণগুলি যুক্ত হলে প্রায়শই হৃৎপেশীভঙ্গ সহ করোনারি থ্রম্বসিস দেখা দেয়। এই সব রোগীর মধ্যে রক্তজমাট গঠনের আশু কারণ যা প্রায়ই দেখা যায় তা হল: করোনারি ধমনীগুলির প্রতিবর্তী আক্ষেপ। এটা ঘটে রোগী ঠান্ডা বাতাসের উল্টো দিকে হাঁটার সময়, রাতে নিদ্রিত অবস্থায়, অধিক রাতে ভরপেট খাওয়ার পর (উদরান্ত্রিক তন্ত্রের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্য) এবং স্নায়বিক আঘাতের ফলে। করোনারি ধমনীতে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় রক্তবাহরোধী

মাংসপেশীর অনৈচ্ছিক আক্ষেপ শুধু দৈবাৎই সুস্থ করোনারিসম্পন্ন কোন অল্পবয়সীর হৃৎপেশীভঙ্গ ঘটাতে পারে।

রুশ বিজ্ঞানী ভি, আরাজত্সভ ও ন, স্ত্রাজেস্ক সর্বপ্রথম হৃৎপেশীভঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ লোকের মধ্যেও মাঝেমধ্যে এই রোগটি হঠাৎ দেখা দিতে পারে। কিন্তু কার্যত হৃৎপেশীভঙ্গ হল শরীরের উপর, বিশেষত হৃৎপিন্ডের উপর পূর্ববর্ণিত স্নায়ুবিকার, শ্বাসার্তি-হৃৎশূল ও উচ্চ রক্তচাপের কুপ্রভাবেরই এক চূড়ান্ত ফলশ্রুতি। এই রোগগুলি ধমনীকাঠিন্যের সঙ্গে একযোগে হৃৎপেশীভঙ্গ ঘটাতে পারে।

সাধারণত হৃৎপেশীভঙ্গের সূত্রপাত ঘটে শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের (মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী) আক্রমণ থেকেই। অল্পক্ষণের জন্য রোগীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। রক্তপরীক্ষায় রক্তে শ্বেতকণিকার মাত্রাধিক্য এবং রক্তকণিকার অধিক তলানি ধরা পড়ে। এই রোগ পরীক্ষার পদ্ধতি হিসাবে ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাফি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইলেকট্রকার্ডিওগ্রাম নিখুঁতভাবে হৃৎপেশীভঙ্গের অস্তিত্ব সনাক্ত করে। এতে কোন রক্তনালী বন্ধ হয়েছে ও পরিশেষে কিভাবে রোগী সেরে উঠছে তাও বলে দেয়া যায়।

স্নায়ুবিকার, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসার্তি-হৃৎশূল ও ধমনীকাঠিন্য প্রভৃতি রোগের মতো হৃৎপেশীভঙ্গ প্রতিরোধও মূলত অভিন্ন প্রক্রিয়াধীন। ধমনীকাঠিন্য প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত খাদ্যতালিকা এই রোগেও প্রযোজ্য। পরিসংখ্যান ইত্যাদি থেকে তা সত্যাখ্যাত হয়েছে। যেসব দেশে শাকসবজি প্রধান খাদ্য (যাতে কোলেস্টরাল নেই), যেমন জাপান, চীন, স্পেন, আফগানিস্থান প্রভৃতি, সেখানে অন্যান্য দেশের তুলনায় হৃৎপেশীভঙ্গ খুবই কম।

45-50 বছর বয়সী লোকের পক্ষে, বিশেষত সে শ্বাসার্তি-হৃৎশূলের রোগী হলে, ভরপেট খেয়ে শুয়ে থাকলে তার হৃৎপেশীভঙ্গ দেখা দিতে পারে। তাই এদের পক্ষে ডিনারের পরে শোওয়া নিষেধ এবং রাতের খাওয়া শেষে তিন ঘণ্টা পর শুতে যাওয়া উচিত।

ওজনবৃদ্ধি এড়ানোর জন্য (সমৃদ্ধ ও শর্করাপ্রধান খাবার এবং মিষ্টি কম খাওয়া) এইসব রোগীদের কঠোরভাবে খাদ্যবিধি মেনে চলা এবং নিয়মিত খাবার খাওয়া (দিনে 3-4 বার এবং বেশি পরিমাণে নয়) প্রয়োজন। শীতের প্রচন্ড বাতাসে এদের বাইরে যাওয়া অনুচিত এবং

কঠিন শ্রমের কাজ, অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং অত্যধিক উত্তেজনা ও ধূমপান অবশ্যই পরিহার্য।

হৃৎপেশীভঙ্গের বারবার আক্রমণ এড়ানোর জন্য রোগীদের উপরোক্ত বিধিগুলি বিশেষ যত্নের সাথে পালন করা উচিত।

বুকে প্রচন্ড ব্যথা দেখা দিলে ও তা হাত ও ঘাড়ের দিকে ছড়িয়ে পড়লে রোগীর জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া ও নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরিবারের লোকজন অথবা প্রতিবেশী একজন প্রাথমিক সাহায্যকারী ডাক্তারকে ডেকে আনবে এবং ডাক্তার আসার আগেই রোগীকে কিছুটা নাইট্রোগ্লিসারিন খেতে হবে। ডাক্তার হৃৎপেশীভঙ্গ সনাক্ত করলে বিছানায় শুয়ে থেকে পূর্ণ বিশ্রামের এবং উপযুক্ত খাদ্যতালিকার বিধান দেবেন। ডাক্তারের পরামর্শ কঠোরভাবে মেনে চলা, প্রফুল্লতা বজায় এবং নিরাময়ে বিশ্বাস রাখা রোগের বৃদ্ধিরোধে সহায়তা দেয়। সংশ্লিষ্ট লোকজনের উচিত শান্ত পরিবেশ বজায় রাখা এবং রোগীকে উত্তেজিত না করা।

দীর্ঘদিন বিছানায় থাকা (কমপক্ষে একমাস), নিম্নতম মাত্রায় চর্বি ও কোলেস্টারোলযুক্ত খাবার, হালকা খাওয়া, বিশ্রাম ও যথেষ্ট ঘুম, প্রফুল্লতা ও রোগমুক্তিতে পূর্ণ আস্থা — এই তো চিকিৎসার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই তুলনায় ওষুধের ভূমিকা খুবই কম। বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণ অত্যন্ত উপকারী।

রক্তজমাট বাধার ও রক্তজমাট গঠনের ক্ষমতা হ্রাসকারী ওষুধ আজকাল পাওয়া যায়। একই ওষুধ আবার হৃৎপেশীভঙ্গ প্রতিরোধে ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, এক্ষেত্রে বার বার রক্তপরীক্ষা (রক্তের সান্দ্রতা ও প্রথ্রম্বিনের মাত্রা নির্ধারণের জন্য) প্রয়োজন। রক্তে প্রথ্রম্বিনের মাত্রা বাড়লেই কেবল ওষুধের ব্যবস্থা কর হয়।

হৃৎপেশীভঙ্গের রোগীদের কি চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম প্রয়োজন? অবশ্যই একান্ত প্রয়োজনীয়। দীর্ঘদিনের বাধ্যতামূলক বিশ্রাম এবং সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে থাকার জন্য সমস্ত শরীরের, প্রধানত স্নায়ুপেশীগত যন্ত্রপাতি ও হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের মুখ্য কর্মক্ষমতা কমে যায়। শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত দেহের দক্ষতা এবং ন্যূনতম চেষ্টায় এটা-ওটা সম্পাদনের সামর্থ্য হ্রাস পায়: শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইতিপূর্বে দীর্ঘ প্রশিক্ষণে অর্জিত সবকিছুরই কিছুটা হারিয়ে যায়।

সুস্থ হওয়ার পূর্বে বিছানা থেকে ওঠার, হাত-পা নাড়ার চেষ্টা, অনেক্ষণ কথাবার্তা চালান, শরীর টান-টান করা ইত্যাদির মধ্যেই রোগীর দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বহুদিনের হৃৎপেশীভঙ্গ আক্রান্ত রোগীদের আধুনিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষভাবে বিশদীকৃত শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা রয়েছে। চিকিৎসাম্মত ব্যায়াম (রোগীর অবস্থা ভালোর দিকে গেলে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে) সামান্যতম মাত্রা থেকে ক্রমে ক্রমে, প্রায় বোঝা যায়না এমনভাবে বাড়াতে হবে। শারীরিক ব্যায়ামকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে (5-7 বার শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া, ধীরে, ছন্দবদ্ধভাবে, 2-3 মিনিট পর পর পুনরাবৃত্তি) সম্পর্কিত করতে হবে। এই সকল ব্যায়াম ও পরে পদব্রজে ভ্রমণ অভ্যাসে পরিণত হলে দেহের মুখ্য কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে ফিরে আসে। প্রাক্তন রোগী স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। এই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে 3-6 মাস সময় লাগে।

হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবার পর বা বাড়িতে চিকিৎসা শেষ হলে রোগীর কর্মক্ষমতার মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বটে। কেননা এতে ব্যাপক তারতম্য ঘটতে পারে। রোগীদের মধ্যে দুটি চূড়ান্ত ধরন দেখা যায়। কেউ কেউ ভুগে-ওঠা গুরুতর রোগটি সম্বন্ধে মোটেই সচেতন থাকেনা এবং কাজ সম্পর্কে তাদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধেও কান দেয় না। পক্ষান্তরে অন্যরা সামান্য মাত্রায় হৃৎপেশীভঙ্গে ভোগা সত্ত্বেও এবং তাদের কাজের উপর তেমন কোন বিধিনিষেধ আরোপিত না হলেও তারা হতাশ হয়ে পড়ে। ডাক্তারের উপদেশ, নিজের ও স্বীয় কাজের প্রতি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি এবং রোগীকে এক ধরনের ব্যবহারে অভ্যস্ত করা, যার উপরই তার পরবর্তী স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। যাহোক, হৃৎপেশীভঙ্গ পূর্বাহ্নে ধরা পড়লে উপযুক্ত চিকিৎসা ও যোগ্য পেশানির্বাচনের মাধ্যমে এই রোগনিরাময়ের সম্ভাবনা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল হয়ে উঠেছে।

হৃৎনিষ্ক্রিয়া (হার্ট-ফেল)

যে-রোগে হৃৎপিন্ডের কপাটিকা বা এই কপাটিকাগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হৃৎপিন্ডের ছিদ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রেই হার্ট-ফেল বা হৃৎনিষ্ক্রিয়া

কথাটি প্রযোজ্য। প্রায়ই রোগটি কপাটিকার স্ফীতির ফল হিসাবে জন্মে (হৃৎমধ্যপ্রদাহ বা এন্ডোকর্ডিটিস)। কোন কোন ক্ষেত্রে কপাটিকা ছিদ্রগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারেনা। ফলত হৃৎনিষ্ক্রিয়া — কপাটিকার দৌর্বল্য — দেখা দেয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যকার ছিদ্রগুলি অথবা নিলয় ও নিলয়জাত রক্তনালীগুলি (মহাধমনী ও ফুসফুসাধিগ ধমনী) সংকুচিত হয়। এই সব পরিবর্তনের ফলে রক্তসঞ্চালন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন বিভাগের কাজে অস্বাভাবিক দ্রুতগতি বা মন্দাভাব দেখা দেয়।

পুরো শরীরের সাহায্যে হৃৎপিন্ড তার কার্যকলাপ পুনর্গঠনের মাধ্যমে কপাটিকাকে প্রভাবিত করে। যেমন, কোন ক্ষতিগ্রস্ত দ্বিমুখী কপাটিকা বাম নিলয় সঙ্কোচনের সময় বাম অলিন্দ-নিলয় রন্ধ্রটি পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলে মহাধমনীর দিকে প্রবাহিত রক্তের কিছু অংশ অলিন্দে ফিরে আসে। অতিরিক্ত কিছু রক্ত পেয়ে বাম অলিন্দ স্ফীত হয়, এটির পেশীবহুল প্রাচীর তার কাজ বাড়িয়ে দেয় ও আরও পুরুষ্টু হয়ে ওঠে। এইভাবে অলিন্দ বাড়তি রক্তটুকু থেকে নিজেকে মুক্ত করে। অর্থাৎ, বাম নিলয় বিস্তারের সময় অলিন্দ পুরো রক্তটুকু থেকে নিজেকে মুক্ত করে। অর্থাৎ, বাম নিলয় বিস্তারের সময় অলিন্দ পুরো রক্তটুকু নিলয়ে পাম্প করে ঢুকিয়ে দেয়। ফলত রক্ত কোথাও জমে থাকেনা এবং হৃৎপিন্ড রক্তসঞ্চালনের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। বাম নিলয়ের বাড়তি কাজটুকু বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে।

এমন বহু ক্ষতিপূরক প্রক্রিয়া আছে। সেজন্য হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় আক্রান্ত বহু রোগীর শরীরেই রক্তসঞ্চালনে সরাসরি কোন বিঘ্ন ঘটেনা এবং রোগীদের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণই অটুট থাকে। এগুলিকে পরিপোষক হৃৎনিষ্ক্রিয়া বলা হয়।

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে হৃৎপিন্ডের কপাটিকা ও হৃৎপেশী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রোগীর জীবন খুবই অনিয়মিত হয়ে ওঠে। আবার কখনো কখনো সংক্রামক রোগ হৃৎনিষ্ক্রিয়ার উপর এতটা চেপে বসে যে হৃৎপিন্ড ও পুরো শরীরের খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া হৃৎনিষ্ক্রিয়াজনিত রক্তসঞ্চালনের বিশৃঙ্খলার ক্ষতিপূরণ করতে পারেনা। এই অবস্থাকে পরিপোষণাতীত হৃৎনিষ্ক্রিয়া বলা হয়। কোষকলাগুলি যথেষ্ট অক্সিজেন

না পাওয়ার দরুন এক্ষেত্রে রোগী ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, চামড়া নীল হয়ে যায়। হৃৎপিন্ড অধিকবার সংকুচিত হতে থাকে, পাগুলি ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ফুলে যায় ও প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পায়। এ সবই আসলে রক্তসঞ্চালনের বিশৃঙ্খলার ফলশ্রুতি এবং তা রোগীকে অক্ষম করে দেয়।

হৃৎনিষ্ক্রিয়ার কারণ কি?

বাতজ্বরের (rheumatic fever) জন্যই প্রধানত হৃৎনিষ্ক্রিয়া দেখা দেয়। মতবাদটি 100 বছর আগে যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মস্কোর অধ্যাপক গ, সকোল্‌স্কি ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক জে, বুলাদি। জীবাণুদুষিত (সেপটিক) হৃৎমধ্যপ্রদাহের জন্যও হৃৎনিষ্ক্রিয়ার প্রকোপ সম্ভব। ধমনীকাঠিন্যের ফলেও এই রোগ দেখা দেয়। আবার হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের সিফিলিসের দরুনও হৃৎনিষ্ক্রিয়া ঘটে। দৈবাৎ মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণেরও হৃৎনিষ্ক্রিয়া থাকে। এটা জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়া।

হৃৎপিন্ডলগ্ন বাতজ্বর

বাতজ্বর এমন এক রোগ, যা দেহের যেকোন অঙ্গকে এবং প্রায় সর্বদাই হৃৎপিন্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে হৃৎপিন্ডের আভ্যন্তরীণ, পেশল ও বহিস্থ আবরণীগুলির ক্ষতি ঘটে। এই রোগে অস্থিসন্ধিগুলিও প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেইজন্যই রোগটির পুরানো নাম শিফটিং, অর্থাৎ গ্রন্থিপরম্পরায় চলমান সন্ধিবাত। কখনো কখনো বাতজ্বর গুরুমস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলিকে (বিশেষকরে শিশুদের) আঘাত করে এবং ফলত শিশুদের কোরিয়া রোগ জন্মে। হাঁটার এলোমেলো ধরন, বিকৃত বাকপ্রণালী ও অন্যান্য বিশৃঙ্খলা এই রোগের লক্ষণ।

বাতজ্বর হওয়ার আগে শরীরে প্রায়ই একটি সংক্রমণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং তা বহুদিন পর্যন্ত মুখে (টনসিল ও অসুস্থ দাঁতে) বা অন্যান্য প্রত্যঙ্গে টিকে থাকে ও প্রায় কখনই ধরা পড়েনা। এই প্রাথমিক সংক্রামণকেন্দ্রে সংবেদনশীলতা ও বিক্রিয়াশীলতা বাড়িয়ে শরীরকে (প্রধানত স্নায়ুতন্ত্র, রক্তবাহতন্ত্র ও যোজক কোষকলাকে) ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অবস্থায় শরীরকে এলার্জিপ্রবণ বলা হয়। শরীরের এই সংবেদ্য অবস্থায় নতুন কোন সংক্রমণবিন্দুর উদ্ভব, পুরানোটির বৃদ্ধি, কোন স্নায়বিক আঘাত বা তীব্র ঠান্ডায় (সর্দি) বাতজ্বর দেখা দিতে পারে।

প্রায় সকল গবেষকই একমত যে প্রাথমিক সংক্রামণকেন্দ্রের প্রধান কারণ হল স্ট্রেপ্টোকক্কাই। কিন্তু এগুলিই একমাত্র সংক্রামক হেতু কিনা আজও তা নিশ্চিত নয়।

অনেক ক্ষেত্রেই রোগটি নিম্নোক্ত অনুক্রম হিসাবে বিকাশ লাভ করে: টনসিলপ্রদাহের কয়েক দিন বা সপ্তাহ পরে কিংবা শ্বাসতন্ত্রের উপরাংশের প্রচন্ড সর্দির পর একটা বড় অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হয় এবং তারপর আরেকটা, ইত্যাদি। তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং সন্ধিগুলিতে প্রচন্ড ব্যথার জন্য রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং রোগী অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। ডাক্তারের দেয়া বেশি মাত্রার সোডিয়াম স্যালিসিলেট গ্রহণ করলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটে। এতে অস্থিসন্ধির ব্যথা চলে যায় এবং রোগী 2-3 সপ্তাহের মধ্যে পুরোপুরি ভাল হয়ে ওঠে।

প্রায়ই এই আরোগ্যলাভ বাহ্যিক থাকে: অস্থিসন্ধির ব্যথা একেবারেই সেরে যায়; তাপমাত্রা বেশি না থাকলেও স্বাভাবিক অবস্থায় পেঁছিয় না; রোগী বুকধড়ফড়ানি, অস্বস্তিবোধ এবং কখনো কখনো বুকব্যথার কথা বলে। স্টেথিস্কোপে বুক পরীক্ষা করলে সামান্য মর্মর শব্দ শোনা যায়। নাড়ীও অনিয়মিত হয়ে ওঠে। এসবই হৃৎপিন্ডের আভ্যন্তরীণ ও পেশল আবরণের বাতব্যাধির লক্ষণ।

বাতব্যাধিজনিত হৃদাবরণী প্রদাহে সাধারণত বুকের তীব্র ব্যথা সহ হৃৎপিন্ডের বহিরাবরণের রোগাবস্থা কখনো গুরুতর অবস্থায় (অধিকাংশই শিশুদের মধ্যে) পেঁছিয়।

হৃদাবরণীর প্রদাহ খুবই দ্রুত শেষ হয়ে যায়। হৃৎপেশীপ্রদাহ ক্রমান্বয়ে শেষ হতে থাকে। আভ্যন্তরীণ হৃদাবরণীর প্রদাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়, 2-4 মাস পর্যন্ত থাকে। হৃৎপিন্ডের কপাটিকাগুলি আভ্যন্তরীণ হৃদাবরণীর প্রদাহে প্রায়ই পূর্বোক্তভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং পরিশেষে হৃৎনিষ্ক্রিয়া দেখা দেয়।

বাতজ্বরের প্রথম আক্রমণজনিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় রোগীর রক্তসঞ্চালন ও কর্মক্ষমতায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বারবার বাতজ্বরের আক্রমণ ঘটলে (বিশেষত রোগী ডাক্তারের নির্দেশমতো না চললে) প্রত্যেক নতুন আক্রমণেই হৃৎনিষ্ক্রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। হৃৎনিষ্ক্রিয়ার ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর না হলে রোগী অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

জানা অত্যাবশ্যকীয় যে হাসপাতালে (বা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে)

বাতজ্বরের ভাল চিকিৎসার সুযোগ নিলে এবং অটল দৃঢ়তার সাথে রোগের পুনরাক্রমণ রোধ করলে বাতজ্বরজনিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার উপশম এবং দীর্ঘদিন কর্মদক্ষতা অটুট রাখা সম্ভব।

কখনো বাতজ্বর হয়েছিল কিনা অনেক সময় রোগী বা তার বাপ-মা কেউই তা স্মরণ করতে পারেনা। যাই হোক, অস্থিসন্ধিগুলি কখনই আক্রান্ত হয়নি এবং কোনদিন বুকে ব্যথা অনুভব করেনি, এমন লোকের সাধারণ স্বাস্থ্যপরীক্ষায় বা কোন বিশেষ রোগের জন্য স্বাস্থ্যপরীক্ষায় পরিপোষক হৃৎনিষ্ক্রিয়া ধরা পড়তে পারে। এই আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে রোগীর কোন এক সময় বাতজ্বর হয়েছিল। কিন্তু, এতে অস্থিসন্ধি জড়িত ছিলনা। রোগীকে সতর্কভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রায়ই দেখা যাবে যে রোগী টনসিলপ্রদাহে ভুগেছে এবং কয়েকবারই তার ফ্লু হয়েছিল এবং 2-1 সপ্তাহ ধরে তার সামান্য কিছুটা জ্বর থাকত (বস্তুতপক্ষে এটা মোটেই ফ্লু নয়, আভ্যন্তরীণ হৃদাবরনীপ্রদাহ)।

সম্পূর্ণ পরিপোষিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার কোন চিকিৎসারই প্রয়োজন হয়না।

পরিপোষিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার রোগীরা স্বাস্থ্যবান লোকদের মতো অভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

যে-সকল রোগীর হৃৎনিষ্ক্রিয়া আছে তাদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তবে, এরকম অনেকই আছে যারা পরিপোষিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার রোগী (মিট্রেল ও মহাধমনীর রক্তাল্পতা) হয়েও কেবল শরীরচর্চাই করেনা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় উপদেষ্টার কাজ করে এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেকর্ডেরও অধিকারী হয়েছে (যেমন সাঁতার)। অনেক দিন যাবৎ আমরা এক রোগীকে তত্ত্বাবধানে রেখেছি (10 বছর যাবৎ)। সে 18 বছর বয়সের সময় আহত হয়েছিল। একটা বুলেট তার দ্বিপত্রিক কপাটিকা ভেদ করে হৃৎপিন্ডে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যে আটকে ছিল। এই মারাত্মক অবস্থা সত্ত্বেও (আঘাতজনিত হৃৎনিষ্ক্রিয়া ও হৃৎপেশীতে গুলি) রোগীকে তিন মাস হাসপাতালে চিকিৎসার পর পুরো সুস্থ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়। সে বাড়িতে ও চাকুরীতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালায়। শরীর, বিশেষত অল্পবয়সীর শরীর হৃৎপিন্ডের গভীরতম ক্ষতও পরিপোষণ করতে পারে।

পরিপোষিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় রোগীর শরীরচর্চা ও সাধারণ খেলাধুলা

শুধু অনুমোদিতই নয়, নির্দেশিতও। কেননা, তা শরীরকে মজবুত করে এবং সকল রোগের, বিশেষত বাতজ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি বাড়ায়।

বাতজ্বর নিয়ন্ত্রণ হৃৎনিষ্ক্রিয়ারোধে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বাতজ্বর সারা দুনিয়ার জন্যই এক দুর্বিপাক বিশেষ। বিশ্বব্যাপী এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। বাতজ্বর সমিতি গঠিত হয়েছে প্রত্যেকটি দেশে। কিন্তু, যুদ্ধজয় এখনো সম্ভবপর হয়নি। এখনো লক্ষ লক্ষ মানুষ বাতজ্বরজনিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় ভুগছে।

বাতজ্বরে শিশুরাই প্রধানত আক্রান্ত হয়। শিশুচিকিৎসক ও শিশুস্বাস্থ্যরক্ষায় নিযুক্ত সকলেরই প্রধানতম কর্তব্য হল এই রোগের কারণগুলি সঠিকভাবে জানার জন্য বহুমুখী গবেষণা এবং এই রোগের বিরুদ্ধে সব রকমের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ। বাতজ্বরের, হৃৎপিন্ডের এই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামে এবং প্রধানত বাতব্যাধি রোধের জন্য আমরা পিতামাতা, শিক্ষকবৃন্দ ও গনসংগঠনগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজনীয় মনে করি। চিকিৎসকের নির্দেশ রোগীদের যথাযথ পালন করাও প্রয়োজন।

এই রোগের চিকিৎসায় বেশি মাত্রায় সোডিয়াম স্যালিসিলেট, পিরামিডিন (এক্ষেত্রে সর্বদাই রক্তপরীক্ষা প্রয়োজন) অ্যাসপিরিন ও বুটাডিয়ন ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্টিসন এবং হাইপোপাইসিসের অ্যাড্রিনোকর্টিকোর্টপিক হোর্মনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চিকিৎসার প্রণালী নির্বাচনে চিকিৎসক অবশ্যই রোগীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করবেন।

বাতজ্বরের চিকিৎসা আসলে হৃৎনিষ্ক্রিয়ার বিলম্বিত নিবারক চিকিৎসা হিসাবেই বিবেচ্য। বাতজ্বরজনিত হৃৎনিষ্ক্রিয়া পূর্বাহ্নে প্রতিরোধ করলে বাতজ্বররোধী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ অবশ্যই সহায়তা যোগাবে। এতে রয়েছে প্রথমত, দেহমধ্যে কোন এক সময় গঠিত সংক্রমণের ক্রনিক অকুস্থলের অবিরাম চিকিৎসা। টনসিলের রোগগুলির ধারাবাহিক চিকিৎসাও সবিশেষ প্রয়োজন এবং ডাক্তারের উপদেশমতো তা তুলে ফেলা উচিত।

শরীরকে ঠান্ডায় অভ্যস্ত করাতে হবে। ঠান্ডা স্পঞ্জ-স্নান দ্বারা তা সম্ভব। পা এবং গলা (সঠিকভাবে বললে শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশ) শক্ত করতে পা ও গলা ঠান্ডা জলে স্পঞ্জ করা (কেবল স্বাস্থ্যবান লোকের

ক্ষেত্রে) উপকারী। সকলেরই বাইরে, বিশেষত শীতকালে শুধু নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া উচিত। নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হলে কোন বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে নাকটি খোলসা করা প্রয়োজন।

স্মর্তব্য, পরিপোষিত হৃৎনিষ্ক্রিয়া অলক্ষিত সাধারণ বাতজ্বরে (অস্থিসন্ধি পেশীগুলিতে ব্যথা, অসুস্থতা, বুকধড়ফড়ানি ও অল্প জ্বর) আবার অপরিপোষিত হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা উচিত। রোগীর রক্তসঞ্চালনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাকে অবশ্যই বিশেষ পথ্য গ্রহণ করতে হবে।

ডাক্তারের নির্দেশমতো পানীয়ের পরিমাণ (তরল খাদ্য সহ) 0.8-1.0 লিটারে সীমাবদ্ধ হতে হবে। কখনো কখনো রোগীকে আরও কম তরল খেতে হতে পারে। নোনা খাবার, নিষিদ্ধ। অধিক তরল হৃৎপিন্ডকে ভারাক্রান্ত করে আর সাধারণ লবণ শরীরের আভ্যন্তরীণ তরল পদার্থ ধরে রাখে এবং স্ফীতির বৃদ্ধি ঘটায়।

যে-সকল খাদ্য অন্ত্রে অতিরিক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে এবং উদরস্ফীতির মাধ্যমে শ্বাসকষ্ট ঘটায় সেইসব খাবার বর্জনীয়।

কিডনি দুটি সুস্থ থাকলে মাংস খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া উচিত নয়। কারণ, প্রত্যঙ্গগুলি, বিশেষত হৃৎপেশীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন প্রয়োজন। দই অত্যন্ত স্বাস্থ্যপদ। যকৃতের উপর দইয়ের প্রভাব খুবই অনুকূল এবং তা মূত্র বৃদ্ধি করে। আলু ও কাঁচা আপেলও মূত্রবর্ধক।

রোগীদের খেতে হবে বারবার কিন্তু পরিমাণে কম।

বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণ খুবই উপকারী। কেননা, অক্সিজেন শুধু শ্বাসকষ্টই প্রশমিত করেনা, রক্তপ্রবাহের বিশৃঙ্খলাজনিত ক্ষতিগ্রস্ত জারণক্রিয়াকেও উন্নত করে এবং সমস্ত শরীরের উপর সুপ্রভাব ফেলে।

এমনকি রক্তসঞ্চালনের মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তা যথানিয়মে রোগীর অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে পারে ও নিজ কাজে তার ফিরে যাওয়া (এক্ষেত্রে কাজের পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হওয়া প্রয়োজন) সম্ভব করে তোলে। হৃৎনিষ্ক্রিয়া পরিপোষিত হওয়ার পর কোন ডাক্তারের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে সুপরিচালিত চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম খুবই উপকারী।

হৃৎনিষ্ক্রিয়ার পরিপোষণ অনেকটা সময়সাপেক্ষ ও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

এতে কর্মক্ষমতা ফিরে আসে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পরে। রোগীদের কখনো কখনো বাধ্যতামূলকভাবে কাজ থেকে বিরত করান হয়। কিন্তু এসবই হল হৃৎপিন্ডে অস্ত্রোপচারের অপূর্ব সাফল্যলাভের আগেকার ঘটনা। হৃৎপিন্ডে অস্ত্রেপচারের কল্যাণে সকলের না হলেও বহুরোগীর ভাগ্যই আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। কিছুকাল আগে আকাদমিশিয়ান আ. ভিস্‌নেভস্কি, ব. পেত্রভ্‌স্কির মতো কয়েকজন প্রখ্যাত সার্জন সহ কেউ কেউ সোভিয়েত ইউনিয়নে হৃৎনিষ্ক্রিয়ার রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করেন। তাঁদের অধীন ইনষ্টিটিউটগুলি ছিল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসজ্জিত ও যোগ্যতম ব্যক্তিত্বে অলংকৃত। বর্তমানে হৃৎরোগগুলির, বিশেষত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার অস্ত্রেপচার চিকিৎসা বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বহু ক্লিনিক ও হাসপাতালে এই ধরনের অস্ত্রোপচার চলছে। হৃৎপিন্ডের অস্ত্রেপচারে সার্জনরা প্রায়ই বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে শরীরের তাপ নামিয়ে কৃত্রিম রক্তসঞ্চালন চালু করেন। এই পদ্ধতিতে সার্জনরা দেহ থেকে সাময়িকভাবে (2-1 ঘণ্টা) বিচ্ছিন্ন হৃৎপিন্ডে অর্থাৎ তথাকথিত শুকনো হৃৎপিন্ডে অস্ত্রোপচার চালান। রোগীর দেহতাপ নিম্নপর্যায়ে থাকার ফলে বিপাকক্রিয়া দ্রুত হ্রাস পায় এবং রোগীর সকল প্রত্যঙ্গ ও কোষকলা রক্তসরবরাহ ব্যতিরেকে সহজেই টিকে থাকতে পারে। সাধারণত জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার মতো জোট-পাকান হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় এই ধরনের অস্ত্রোপচার করা হয়ে থাকে।

হৃৎপিন্ডের সংকীর্ণ হয়ে ওঠা ছিদ্রের অস্ত্রোপচারেই বিশেষত উল্লেখ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

খাঁটি মিট্রেল (দ্বিপত্রিক) কপাটিকার সংকীর্ণতার অস্ত্রোপচারের আশু ফল কি? সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী (বহু হাজার লোকের) সোভিয়েত ইউনিয়নে শতকরা 92.9 ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেছে। প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংখ্যাটি 98.5-95.1 শতাংশের মধ্যে ওঠা-নামা করে। অর্থাৎ, অন্যান্য অনেক অস্ত্রোপচারের চেয়ে এতে ভাল ফল ফলছে।

নিচে পর্যবেক্ষণের ফলাফল উল্লিখিত হল (অস্ত্রোপচারের 5 বা ততোধিক বছর পর)। রোগীদের 60% ভাগের স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন ভাল, এমনকি খুবই ভাল। তাদের কর্মক্ষমতা প্রায় পুরোপুরি ফিরে

এসেছে। 25%-30% ভাগ অস্ত্রোপচারে আগের চেয়ে ভাল আছে। কেবলই শতকরা 7 বা 8 ভাগের অবস্থা বদলায়নি। সুতরাং হাজার হাজার রোগীর হৃৎপিন্ডকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং এমনকি বলা যায় আবার নবায়িত করা গেছে।

অন্যান্য জটিলতর ও জোট-পাকান হৃৎনিষ্ক্রিয়ার অস্ত্রোপচারেও ভাল ফল ফলেছে।

জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়া

জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার অস্ত্রোপচার হল হৃৎপিন্ড আস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ও এক মহত্তম সাফল্য বটে। কিছুদিন আগেও ভ্রূণাবস্থায় জায়মান এই রোগ নিয়ে যেসব শিশু জন্মাত তাদের চিকিৎসার কোনই উপায় ছিলনা।

মাতৃগর্ভে থাকার সময় জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়া ও হৃৎপিন্ডের অন্যান্য বিরল রোগ (যা এখানে আলোচিত হবে না) কেন জন্মে?

এগুলির কারণ অসংখ্য। যেমন: মায়ের শরীরে বহুদিনের ভিটামিনের অভাব, গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে কোন কোন ভাইরাসঘটিত সংক্রামক রোগ, মদ্যপানজনিত উন্মত্ততার সময় গর্ভসঞ্চার, তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া (নাগাসাকি ও হিরোসিমার মর্মান্তিক ঘটনা) এবং জরায়ুমধ্য আভ্যন্তরীণ হৃদাবরণীর প্রদাহ।

জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়া দৈবাৎই একক ব্যাধি হয়ে থাকে। প্রায়ই তা ব্যাধিপুঞ্জ হিসাবেই প্রকটিত হয়। বহু ধরনের জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়া রয়েছে। এগুলির মধ্যে নীলায়নের (হাত ও পায়ের আঙুল ও গাল নীলচে) সঙ্গে কোষকলায় অক্সিজেন সরবরাহের সুস্পষ্ট অভাব থাকলে (তথাকথিত নীলরোগ) আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি হয়।

কোন কোন সময় জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়া বহুদিন অজ্ঞাত থাকে।

আক্রান্ত শিশুদের অধিকাংশেরই শারীরিক ও মানসিক বিকাশ প্রহত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে আধুনিক অস্ত্রোপচার কৌশলের অন্যতম সেরা সাফল্য — জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার অস্ত্রোপচার — শিশুদের ভাগ্য আমূল বদলে দিয়েছে।

প্রারম্ভিক, এখনো অপরিবর্তনীয় নয়, হৃৎপেশীর (মায়োকার্ডিয়াম) এমন পরিবর্তনগুলিই (যা মূলত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিঘ্ন) হল হৃৎপেশীর পুষ্টিত্রুটি। হৃৎপেশীর পুষ্টিত্রুটি কোন একক ব্যাধি নয়। এটা অন্যান্য রোগসংশ্লিষ্ট, যেমন রক্তহীনতা, অন্তর্স্রাবীগ্রন্থির ত্রুটি, মেদবাহুল্য, শীর্ণতা, সংক্রামক রোগ, কিডনি প্রদাহ এবং যকৃতের অসুখ। এই সকল রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় হৃৎপেশীর পুষ্টিত্রুটি নিরাময়ও সম্ভবপর হতে পারে।

হৃৎপেশীর পুষ্টিত্রুটির শুরুতে রোগী স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ কিছুই অনুভব করেনা। সে কর্মক্ষমও থাকে। সমস্ত শরীরের, বিশেষত হৃৎপেশীর উপযুক্ত পুষ্টি ও অক্সিজেনের অভাবের জন্যই রক্তহীন ও শীর্নদেহী লোকদের মধ্যে হৃৎপিন্ড দৌর্বল্যের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়। এই রোগীর শরীরে সাধারণ দুর্বলতা, কায়িক শ্রমের সময় ঘনশ্বাস ও বুকধড়ফড়ানি দেখা দেয়। লোহা, অ্যাসকার্বিক অ্যাসিড (ভিটামিন C), প্রোটিন, বিশেষত জৈব প্রোটিন (মাংস ইত্যাদি), ফল, শাকসবজি এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও দীর্ঘ বিশ্রাম গ্রহণে এই লক্ষণগুলি অচিরেই লোপ পায়। সাবধানে পরিচালিত, ক্লান্তিকর নয় অথচ ক্ষুধা বাড়ায় ও খাদ্য হজমে সহায়তা দেয় এমন বিভিন্ন ব্যায়াম রক্তসঞ্চালনের উন্নতি ঘটায় ও হৃৎমাংসপেশীকে মজবুত করে।

ডিপথেরিয়া, টাইফাস, বিশেষত টাইফয়েড, বাতজ্বর, লোহিত জ্বর, তীব্র ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য সংক্রামক জ্বর থেকে হৃৎপেশীর রোগ (প্রদাহ ও অন্যান্য পরিবর্তন) জন্মাতে পারে। রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে এবং কিছুদিন পর্যন্ত হৃৎপিন্ডের দুর্বলতায় ভোগে। হাসপাতালে হৃৎপেশীপ্রদাহের চিকিৎসায় রোগীকে বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়।

সংক্রামকরোগ প্রতিরোধ, সংক্রামক হৃৎপেশীপ্রদাহ প্রতিরোধে সহায়তা যোগায়।

হৃৎপেশীর দীর্ঘস্থায়ী রোগে ক্রমে ক্রমে নানা পেশীতন্তুর স্থলে ক্ষতকোষ জন্মায়, এবং সেগুলি সঙ্কুচিত হতে না পারায় আরও ক্ষতকোষ জন্মে এবং ফলত হৃৎপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

বহুদিনের (বহু বছরের পুরানো) হৃৎপেশীর পুষ্টিত্রুটি, সংক্রামক রোগ, সুরাসক্তি, কোন বিষক্রিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করোনারি ধমনীর কাঠিন্য, এই সকল রোগ থেকে হৃৎপেশীর ক্ষততন্তুজনিত পরিবর্তন ঘটতে পারে। জীবাণুঘটিত অথবা অন্য কোন বিষক্রিয়া পেশীতন্তুজনিত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। জীবাণুঘটিত অথবা অন্য কোন বিষক্রিয়া পেশীতন্তুকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করে। ধমনীস্থূলতা রক্তসরবরাহ কমিয়ে দিয়ে হৃৎপেশীকে প্রভাবিত করে। কেননা, কাঠিন্য অথবা আক্ষেপ দ্বারা করোনারি ধমনীগুলি সংকুচিত হওয়ার জন্য এদের মধ্য দিয়ে খুব কম রক্ত (ফলত অক্সিজেনও) প্রবাহিত হতে পারে। রোগটি সাধারণত মধ্যবয়সে শুরু হয় এবং বহুদিন (বহু বছর বা কয়েক দশক) পর্যন্ত রক্তসঞ্চালনে বিঘ্ন না ঘটিয়েও চলতে পারে।

হৃৎপেশীর তন্তুক্ষয়জনিত পরিবর্তন রোধ করতে হলে যে-সমস্ত রোগে হৃৎপেশীর পুষ্টিত্রুটি ঘটে সেগুলির চিকিৎসা এবং ধমনীকাঠিন্য রোগের বৃদ্ধিকে ঠেকান প্রয়োজন। রক্তহীনতা ও হৃৎপেশীর পুষ্টিত্রুটির সময়োচিত চিকিৎসা, উপযুক্ত খাদ্য এবং শারীরিক ব্যায়াম, মদ্যপান ও ধূমপান কমান হৃৎপেশীর তন্তুক্ষয়রোধে সহায়তা যোগায়।

হৃদাবরণীর রোগ

হৃদাবরণীপ্রদাহে, অর্থাৎ হৃৎপিন্ডবেষ্টক ঝিল্লির প্রদাহে এটির ভাঁজের উপরিতল খস্‌খসে হয়ে যায়। হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনের সময় ভাঁজগুলির পারস্পরিক ঘর্ষণে একটি মর্মর শব্দ ওঠে এবং ডাক্তার তা স্টেথিস্কোপ দিয়ে বুঝতে পারেন। এতে রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে। একেই বলা হয় শুষ্ক হৃদাবরণীপ্রদাহ। রোগটি হয় খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায় কিংবা নিস্রাবক হৃদাবরণীপ্রদাহে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, হৃদাবরণীর ভাঁজে ক্ষরিত তরল পদার্থ জমে উঠে হৃৎপিন্ডের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। চিকিৎসায় এই তরল শুকিয়ে ফেলা যায়। এই তরল বেশি পরিমাণে জমে উঠলে বিশেষ ধরনের যন্ত্র দ্বারা তা নিষ্কাশন করা হয়।

হৃদাবরণীপ্রদাহ একক রোগ হিসাবে খুব কমই জন্মে। যে-সকল রোগী বাতজ্বর, যক্ষ্মা, রক্তদুষ্টি অন্যান্য রোগে ভোগে তাদের মধ্যেই এটি জন্মে। এইসব রোগ প্রতিরোধ করলেই হৃদাবরণীপ্রদাহও নিরাময় করা

যায়। হৃদাবরণীর রোগের জন্য সর্বদা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণই বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্যনিবাসে হৃৎরক্তবাহগত রোগের চিকিৎসা

সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু স্বাস্থ্যনিবাসে শ্রমজীবী মানুষেরা স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারে যায়। হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগগ্রস্ত বহু লোকেও স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসা গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ বাঞ্ছনীয়।

রোগীকে বিশেষ স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠানোর ব্যাপারে রোগীর অবস্থা এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসের বৈশিষ্ট্যগুলিও ডাক্তার বিবেচনা করে দেখেন।

উপযুক্ত জলবায়ু, সীমিত আমোদ-প্রমোদ, স্নায়ুতন্ত্রের অত্যধিক উত্তেজনারোধী রক্ষামূলক অন্যান্য বিধিব্যবস্থা রোগীর স্বাস্থ্যের উপর বিপুল, কখনো-বা চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্যনিবাসের বিধিগুলি মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সাংসারিক ভাবাবেগ ও কৌতূহলগুলি থেকে মন ফেরান আবশ্যকীয়।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে মজবুত করাই স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসার মূল লক্ষ্য। এতে থাকে কার্বনডাই অক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইড স্নান, ক্রমান্বয়ে কঠিনতর পথে হাঁটা ও বিবিধ ভৌতচিকিৎসার ব্যবস্থা। কিন্তু সবরকম ভৌতচিকিৎসা গ্রহণ, স্বাস্থ্যনিবাস থেকে 'সম্ভাব্য সবকিছু নেওয়া' শুধু অনুচিতই নয়, এমন কি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকরও। স্মর্তব্য যে, কোন কোন ভৌতচিকিৎসার চেয়ে স্বাস্থ্যনিবাসের পরিবেশ (পর্বতের দৃশ্যাবলী, অসীম সমুদ্র ও সুন্দর হাওয়া) স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তসঞ্চালনের জন্য মোটেই কম স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসা সম্বন্ধে পাভলভের মতটিই সঠিক। তিনি বলেছেন: জলমগ্ন জায়গায় জলই প্রধান ব্যাপার নয়, রোগীকে তার গতানুগতিক পরিবেশ থেকে যে ছিনিয়ে আনা হয়েছে এটাই বড় কথা।

এমন অনেক স্বাস্থ্যনিবাস আছে যেখানে চিকিৎসক তাঁর রোগীদের হৃৎরক্তবাহতন্ত্র মজবুতের ও চিকিৎসার জন্য পাঠান। কিন্তু সেখানে কেবল এমন রোগীদের পাঠান উচিত যাদের হৃৎরোগ প্রাথমিক পর্যায়ে

রয়েছে। অর্থাৎ, যারা চিকিৎসাসম্মত শরীরচর্চার সুযোগ এবং হৃৎরক্তবাহতন্ত্র মজবুত করার অন্যান্য সুবিধাগুলি (কার্বণ ডাইঅক্সাইড স্নান ইত্যাদি) নেবে ও নিতে পারবে।

এটাও বিবেচ্য যে, অভিযোজনা, অর্থাৎ নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। তদুপরি স্বাস্থ্যনিবাস থেকে পুরানো জায়গায় ফিরে এলে কিছুটা শক্তিক্ষয়ও অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু দূরপাল্লার ভ্রমণ কোন কোন রোগীর পক্ষে ক্লান্তিকর। তাই অভ্যস্ত আবহাওয়ার স্থানীয় স্বাস্থ্যনিবাস, যেখানে পৌঁছতে দীর্ঘ পথভ্রমণ নেই, সেখানে চিকিৎসা গ্রহণ অনেক বেশি সুবিধাজনক।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্নায়ুবিকারে প্রত্যেক রোগীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন রোগী সমুদ্রতীরের (বিশেষত উত্তরে) শান্ত নির্জন জায়গা পছন্দ করে। অন্যদের পছন্দসই হয়ত পাহাড়। কিন্তু পরিবেশ যাই হোক হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের স্নায়ুবিকারগ্রস্ত রোগীকে (বা অন্য রোগীকে) অবশ্যই রোগচিন্তা থেকে মন সরাতে হবে এবং সে অসুখ সম্বন্ধে যথাসম্ভব কম চিন্তাভাবনা ও কথাবার্তা বলবে।

উচ্চ রক্তচাপের প্রারম্ভিক পর্যায়ের রোগীদের চিকিৎসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, বিশেষত স্বাস্থ্যনিবাসে খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

সম্পূর্ণ পরিপোষিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার রোগীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড স্নান নিতে পারে (যদি তখনো পর্যন্ত একটিও কমবেশি উল্লেখ্য হৃদাঘাত না ঘটে)। কিন্তু তাদের অবশ্যই নির্দিষ্ট বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

রুগ্ন রক্তনালী (শিরা ও ধমনী) ও অস্থিসন্ধির রোগীদের জন্য গন্ধক ও র‍্যাডন প্রস্রবণের সুবিধাযুক্ত স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়াই ভাল।

হৃৎপেশীর সামান্য পরিবর্তনে আক্রান্ত বিশেষত মেদপ্রবণ রোগীদের জন্য শৈল স্বাস্থ্যনিবাসগুলিই ভাল। ওইসব স্বাস্থ্যনিবাসে তাদের পাহাড়ে উঠা এবং ক্রমে ক্রমে খাড়া পাহাড়ে উঠার বিধান দেয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিবহাল একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করবেন। তিনি পূর্বতম চিকিৎসকের দেয়া তথ্যগুলি ভালভাবে দেখে তাকে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিধিব্যবস্থা দেবেন। এইসব বিধান রোগীকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী শিরার রোগ কখনও সারে না, হৃৎপেশী বা কপাটিকার ত্রুটি সারান যায় না আর নতুন হৃৎপিন্ড যোজন তো দূরের কথা, শক্ত হয়ে-ওঠা কোন শিরাও কখনো আর স্থিতিস্থাপক হবেনা, এমন বিশ্বাস বিশেষত রোগীদের মধ্যে বহুলপ্রচলিত। ফলত সেই ভুল সিদ্ধান্ত: হৃৎরোগী চিরনিকৃষ্ট কর্মী এবং স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার অবনতিই তার নিয়তি।

শুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা এমন হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে কিন্তু অনেকটাই দূরস্থ। চিকিৎসাবিদ্যার যাবতীয় প্রয়োগ, বিশেষত বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা এর উল্টো কথাই বলে।

ইতিমধ্যেই উল্লিখিত উদাহরণ থেকে আমরা দেখেছি যে বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হৃৎপিন্ডের মারাত্মক ক্ষতের পরেও লোকটির প্রাণহানি হয় নি। সুচিকিৎসার পর তার কোন অসুস্থতা বোধও থাকেনি। সে কর্মক্ষমতাও হারায়নি। কারণ, শরীর ও হৃৎপিন্ডের নিজস্ব প্রক্রিয়াগুলিই সমস্ত সংরক্ষিত পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে হৃৎপিন্ড বা রক্তনালীর সবটুকু ক্ষতিপূরণ করতে পারে। সমস্ত শরীর, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্র হৃৎপিন্ডের স্বাভাবিক কর্মশক্তি পুনরুদ্ধারে অংশগ্রহণ করে। এতে পরিবেশগত উপাদানের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পর্যাপ্ত ও বিভিন্ন খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু, স্নায়ুতন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপসৃষ্টিকারী হেতুগুলি এড়ান যেকোন রোগ, বিশেষত হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের রোগ মোকাবিলায় একান্ত অপরিহার্য।

সোভিয়েত চিকিৎসা একইসঙ্গে রোগবারক ও রোগপ্রতিরোধী। প্রথমত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাবলীর মধ্যে এটা সহজলক্ষ্য। এই ব্যবস্থাবলী অটলতরভাবে রোগীদের উপর প্রয়োগ করা হয়। এগুলি রোগীর দেহকে মজবুত করতে সাহায্য করে এবং রোগীর হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর চিকিৎসাকে আরও কার্যকর করে তোলে। মস্কো ক্লিনিকাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ম. মুদ্রভ (1776-1831) চিকিৎসকদের উপদেশ দিতেন: রোগীর দেহের বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের উপর নজর রেখে রোগের চেয়ে রোগীকে, প্রত্যঙ্গের চেয়ে পুরো মানুষটার চিকিৎসা করাই উচিত। সোভিয়েত চিকিৎসকরা এই ব্যাপারে অভিন্নমত।

একটি বিশেষ বিধি চিকিৎসার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ণকায় রোগীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, মেদবহুল রোগীর জন্য সীমিত খাদ্য, কোন রোগীর পক্ষে শয্যাবন্দী থাকা এবং ক্রমবর্দ্ধমান কর্মতৎপরতা, চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম, নানা ধরনের ভৌত চিকিৎসা ও মনোচিকিৎসা হৃৎরক্তবাহতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদের জন্য আবার গুরুত্বপূর্ণ হল কিছু 'অবশ্যকর্তব্য'। কেননা, এগুলি সমগ্র শরীরের উপর প্রভাব ফেলে এবং শক্তিশালী চালকযন্ত্রের মতো রোগের গতি অনুকূল পথে পরিবর্তিত হতে সহায়তা দেয়।

যেসব ওষুধ সমস্ত শরীরের জন্য উপকারী সেগুলিই হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের চিকিৎসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসকল ওষুধ প্রশান্তিকর ও যথোপযুক্ত ঘুমের নিশ্চায়ক, সেগুলি বহু রোগীর জন্য, বিশেষত স্নায়ুবিকারগ্রস্তদের জন্য উপকারী। শীর্ণদেহ ও রক্তশূন্য ব্যক্তিদের হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে বিশেষ ওষুধের তুলনায় লোহা, ফস্‌ফরাস ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনযুক্ত খাদ্যে প্রায়ই ভাল ফল দেয়।

দীর্ঘস্থায়ী হৃৎরোগে সাধারণত রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, ঘনশ্বাস এবং পা ফুলে ওঠে। ডাক্তারের অনুমোদিত ব্যবস্থা ও সীমিত কাজ সত্ত্বেও রক্তসঞ্চালনের বিশৃঙ্খলা না সারলে হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসা গ্রহণ প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে প্রধান ওষুধ হল ফক্সগ্লোব (ডিজিটেলিস)। এতে ভেগাসকে উত্তেজিত করে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন বাড়ানোর ক্ষমতা নিহিত আছে। ফক্সগ্লোব বা চিকিৎসকের দেয়া অভিন্ন কার্যকর অন্য কোন ওষুধের প্রভাবে হৃৎপিণ্ড অপেক্ষাকৃত ধীরে ও জোরে চলতে শুরু করে, রক্তের স্বাভাবিক সঞ্চালন শুরু হয়, রোগীর কষ্টকর অনুভূতিগুলি চলে যায় এবং সে স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। চিকিৎসাসম্মত ব্যায়াম এবং কখনো এইসঙ্গে কোন স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসা ওষুধের ফলকে সুসংহত করে।

উপযুক্ত পেশানির্বাচন রোগীর পরবর্তী জীবনকে অনেকটাই নিশ্চয়তা দিতে পারে। পেশানির্বাচনের সময় বর্ধিত চাপের সঙ্গে রোগীর দৈহিক সামর্থ্যের সমন্বয়ের দিকে নজর রাখতে হবে।

প্রসঙ্গত অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অর্জিত কৌশলগত ব্যাপক উন্নতি অবশ্যই উল্লেখ্য। সার্জনেরা আজকাল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে তাঁদের পক্ষে অর্জিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলি মেরামত

এবং জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের ত্রুটিগুলি সংশোধন সম্ভবপর।

জনৈক রুশ সার্জন ন. তেরেবিনস্কি কুকুরের উপর নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি করেছেন: প্রথমে কৃত্রিম হৃৎনিষ্ক্রিয়া সৃষ্টি করে রক্তসঞ্চালনে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর পর দ্বিতীয় বার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে হৃৎনিষ্ক্রিয়া সারিয়ে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ চালু করা হয় এবং কুকুরগুলি অনেকদিন বেঁচে থাকে।

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মানুষের সংশোধণযোগ্য ত্রুটিগুলির চিকিৎসা আজকাল বর্ধিত হারে চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়ার অস্ত্রোপচারের আলোচনায় একদা এইসব রোগগ্রস্ত শিশুদের ভাগ্যে কি ঘটত তা পুণঃস্মরণ প্রয়োজন। সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমির হৃৎপিন্ড অস্ত্রোপচার ইনষ্টিটিউটের তথ্যানুযায়ী 20 হাজারেরও বেশি শিশু প্রতিবছর এই জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়া সহ জন্মগ্রহণ করে। ইতিপূর্বে এই শিশুদের 50% এক বছর বয়সের আগেই মারা যেত, 47% শিশু 15 বছর বয়সের পর বাঁচত না। আজ এই সব রোগের সনাক্তি ও রহস্যোদ্ধারের পদ্ধতি সহজতর হওয়ায় এবং কৃৎকৌশলের অনেক উন্নতি ঘটায় জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় স্বাভাবিক রক্তসঞ্চালন পুনরুদ্ধার সম্ভবপর ও বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলত, শিশুদের ভাগ্যও সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এইসব অস্ত্রোপচারে শিশুরোগীদের 70% বা ততোধিক স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠে।

জন্মগত বিশৃঙ্খলা ও ত্রুটি অস্ত্রোপচারের কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখিত হল।

তথাকথিত বটাল্‌স ডাক্ট (মহাধমনী ও ফুসফুসাধিগ ধমনীর সন্ধি) বন্ধ না হলে তা বেঁধে দেয়া কিংবা অস্ত্রোপচারের অন্যতর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক হয়ে ওঠার ফলে রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটে। এই অস্ত্রোপচারগুলি জীবাণুদুষ্ট হৃদাভ্যন্তরীণ প্রদাহকেও বন্ধ করে, যাতে কখনো কখনো বটালসে ডাক্টের আভ্যন্তরীণ আস্তর ফুলে ওঠে।

এই অস্ত্রোপচারগুলি প্রায় 100 ভাগ ক্ষেত্রেই সফল হয়।

ফুস্‌ফুসাধিগ ধমনীর জন্মগত সঙ্কোচন 'নীলরোগের' একটি ধরনের লক্ষণ। এতে ফুস্‌ফুসের রক্তসঞ্চালনে অল্প পরিমাণ রক্ত প্রবেশ করে, অত্যল্প অক্সিজেন পায় এবং শিরারক্তের (নীলচে) আঁচ অব্যাহত থাকে।

এই রোগীর চামড়াও নীলচে (তাই নীল রোগ)। এইসব সহজাত হৃৎনিষ্ক্রিয়াগ্রস্ত শিশুদের জীবনীশক্তি খুব সীমিত থাকে। ফুস্‌ফুসাধিগ ধমনীর সঙ্গে নিম্নকণ্ঠাস্থি শিরা সেলাই করে জুড়ে দেয়াই হল এই ত্রুটির অস্ত্রোপচার। ফলত, রক্ত ফুস্‌ফুসাধিগ ধমনীর মুখের সংকোচনের পাশ কাটিয়ে ডান নিলয় থেকে ফুস্‌ফুসাধিগ ধমনীর শাখাগুলিতে ঢুকে যেতে পারে। এতে রক্ত পর্যাপ্ত অক্সিজেনপুক্ত হয় এবং রোগীর চামড়ার নীলাভ আঁচ লোপ পায়। এই অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে অথবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং তার কর্মক্ষমতা ফিরে আসে, যক্ষ্মাগ্রস্ত হওয়ার ভয় থেকে সে মুক্তি পায়। এই অস্ত্রোপচার না হলে অল্পবয়সেই রোগী যক্ষ্মাগ্রস্ত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

কোন কোন সাদাসিধে স্ত্রোপচার কিছু কিছু জটিলতর জন্মগত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।

অর্জিত (সাধারণত বাতলগ্ন) হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় বহু প্লাস্টিক অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে বাতপ্রক্রিয়ায় অবক্ষয়িত মহাধমনীর কপাটিকার সংস্কার। বাম অলিন্দ-নিলয় রন্ধ্রের সংকির্ণতা, তথাকথিত মিট্রেল স্টেনোসিসের মতো অর্জিত হৃৎনিষ্ক্রিয়ায় প্রায়ই অস্ত্রোপচার করা হয়। ইতিমধ্যেই এরকম হাজার হাজার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

রোগীর বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত থাকায় প্রায়ই এই ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্য জেদ ধরে। কিন্তুস্মর্তব্য, হৃৎনিষ্ক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষত মিট্রেল স্টেনোসিসের রোগীর জন্য এই ধরনের অস্ত্রোপচার নিষ্প্রয়োজন। কেননা, সাধারণ ও পূর্ণ পরিপোষিত মিট্রেল স্টেনোসিসে রক্তসঞ্চালনে উল্লেখ্য বিঘ্ন ঘটে না এবং রোগী পূর্ণ অথবা পরে কিছুটা কম কর্মক্ষম থাকে। পক্ষান্তরে কিছু কিছু রোগীকে বিশেষ কারণে অস্ত্রোপচার করা যায় না। অতএব, অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সার্জন অবশ্যই নিজে বা একজন সহকারীর সাহায্যে বহুবিধ এবং কখনো খুবই জটিল অনেকগুলি পরীক্ষা চালাবেন।

কোন কোন সময় করোনারি ধমনীকাঠিন্যে সার্জনের সাহায্য আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। যথাসময়ে চর্বিযুক্ত ও কোলেস্টারলসমৃদ্ধ খাবার সীমিত করলে (40 বছর বয়েসে) করোনারি ধমনীকাঠিন্যের প্রকোপ প্রশমিত করা যায়। এমনকি রোগটি শুরু হয়ে গেলেও নিয়মিত পথ্যচিকিৎসায়

তা কমান, এমন কি আরোগ্যলাভও সম্ভব। কিন্তু রোগটি অনেকদূর এগোলে এবং স্বাভাবিক চিকিৎসায় নিরাময় অসম্ভব হয়ে উঠলে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে হৃৎপিন্ডের পেশীতে রক্তসরবরাহ বাড়ান যেতে পারে। এতে রক্তনালীসমৃদ্ধ অন্ত্রাবরণী এপিপ্লন হৃৎপিন্ডের সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দেয়া হয়। এই অন্ত্রাবরণী থেকে নূতন রক্তনালী হৃৎপিন্ডে জন্মাতে থাকে, হৃৎপিন্ডে রক্তসরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং করোনারি ধমনীকাঠিন্যজনিত রোগলক্ষণগুলি দূর হয় বা হ্রাস পায়। হৃৎপিন্ড-পেশীতে রক্তসরবরাহের ঘাটতি (তথাকথিত ক্রনিক করোনারি রক্তাল্পতা) চিকিৎসার জন্য অন্যতর কিছু সংখ্যক অস্ত্রোপচারও উদ্ভাবিত হয়েছে। ইতালীর সার্জন ফিয়েস্কি কর্তৃক প্রস্তাবিত এই অস্ত্রোপচারে আভ্যন্তরীণ স্তন-ধমনীর দুপাশে বন্ধনী স্থাপন এখন বহুলপ্রচালিত। এভাবে পাওয়া সমান্তরাল রক্তপ্রবাহে হৃৎপেশীতে রক্তসরবরাহের আশানুরূপ উন্নতি ঘটে। 1961 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ক্রনিক করোনারি রক্তাল্পতার জন্য 1649 জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং 79% জন রোগীরই উল্লেখ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের আগের পরিচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ রোগীর উপর প্রয়োগ করা হয়। আর অস্ত্রোপচারের পরও রোগীদের এই পদ্ধতিগুলি অটলভাবে মেনে চলা উচিত।

হৃৎরক্তবাহতন্ত্রের কার্যকলাপের আকস্মিক অবনতি ঘটলে যখন ধমনীর রক্তচাপ দ্রুত নেমে যায়, হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক ত্বরিত হয় (মিনিটে 120-140 বার), নাড়ী পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে তখন হৃৎপিন্ডের বিশেষ চিকিৎসা ও অন্যান্য নিদানিক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে ওঠে। গভীর ক্ষত ও দাহ, প্রচুর রক্তক্ষরণ ও গুরুতর অসুখেই এমনটি ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক বেদনাহর ওষুধ দেন, শোণিতভরণের ব্যবস্থা করেন এবং পেশী বা শিরায় হৃৎপিন্ডের রোগবারক ওষুধ ইনজেকসন দেয়া সহ রোগীকে গরমে রাখেন।

হৃৎপিন্ডকে মধ্যচ্ছদার ভিতর দিয়ে ছন্দবদ্ধভাবে ম্যাসেজ করে বা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে থেমে-যাওয়া হৃৎস্পন্দন ফেরান যায়। হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনক্ষমতা পুনরুদ্ধার এবং লোকের পুনরুজ্জীবনের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার পরেও কি মানুষকে বাঁচান যায়?

কোন কোন ক্ষেত্রে আজকাল তা সম্ভব। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এমন সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রুশ বিজ্ঞানীরা এই প্রচেষ্টায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

সেই 1902 সালেই তখনকার শারীরবিদ আ. কুলেয়াভকো (1866-1930) এক শিশুর মৃতদেহ থেকে হৃৎপিন্ডটি অপসারিত করে মৃত্যুর 20 ঘন্টা পরও এটিতে স্পন্দন আনতে সমর্থ হন। ফ. আন্দ্রেয়েভ (1879-1952) প্রথম কুকুরের হৃৎপিন্ড পুনরুজ্জীবনের পদ্ধতি বিশদ করেন। 1913 সালে তিনি নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি প্রকাশ করেন। তিনি কুকুরটিকে রক্তপাত ঘটিয়ে অথবা ক্লোরোফর্ম, নিকোটিন ইত্যাদি বিষপ্রয়োগে মেরে ফেলেন। দৃশ্যত মৃত্যুর 3-12 মিনিটের মধ্যে একটি ধমনীর মধ্য দিয়ে কিছু তরল (যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপ লক্ষ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়) হৃৎপিন্ডের দিকে পাম্প করেন। এই তরলে আরও ছিল অ্যাড্রিনেলিন। পরীক্ষিত প্রায় সব ক্ষেত্রেই হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতা তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে, দেখা দেয় শ্বাস-প্রশ্বাস এবং কুকুরটি পুনরুজ্জীবিত হয় ও পরীক্ষার পর কয়েকঘণ্টা বেঁচে থাকে।

আন্দ্রেয়েভ হৃৎপিন্ড পুনরুজ্জীবনের এই পদ্ধতিতে মানুষের চিকিৎসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভ. নিগোভস্কি কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি আন্দ্রেয়েভের পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে আকস্মিক হৃৎস্তব্ধতার ক্ষেত্রে মানুষের পুনরুজ্জীবনের বাস্তব সম্ভাবনা সপ্রমাণ করেন। নিগোভস্কির পদ্ধতির সাহায্যে ইতিমধ্যেই হৃৎস্তব্ধতার অনেকগুলি ক্ষেত্রে ধমনীর মধ্য দিয়ে হৃৎপিন্ডের দিকে রক্ত পাম্প করে নিদানিকভাবে মৃত অর্থাৎ হৃৎপিন্ড ও শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে যাওয়া রোগীর জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছে। ইদানীং সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পশুর হৃৎপিন্ড নিয়ে অনেকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা চালিয়েছেন।

ন. সিনিৎসেন একটা ব্যাঙের হৃৎপিন্ড তুলে ফেলে সেখানে আরেকটি ব্যাঙের হৃৎপিন্ড বসান। ব্যাঙটি অনেকদিন বেঁচেছিল। ভ. দেমিকভ একটি কুকুরের হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস বদলান। কুকুরটি কয়েকদিন বেঁচেছিল। সে হেঁটে বেড়াত, খাবার খেত। একই বছরে দেমিকভ আরেকটি পরীক্ষা করেন। কুকুরটির হৃৎপিন্ড তুলে না ফেলে আরেকটি

হৃৎপিন্ড এতে জুড়ে দেন এবং অস্ত্রোপচারের পর কুকুরটি দুটি হৃৎপিন্ডের মালিক হয়ে ওঠে।

অতএব প্রমাণিত হল যে অন্য পশুর হৃৎপিন্ড কুকুরের দেহে সংযোজিত করা যায় এবং কুকুর দুটি হৃৎপিন্ড নিয়েও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু কোন কুকুরের পক্ষে কি নিজের বা অন্য কারও হৃৎপিন্ড ছাড়া কিছুক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব?

কল্পকাহিনীর মতো হলেও পরীক্ষাক্ষেত্রে ও মানুষের হৃৎপিন্ডের আধুনিক অস্ত্রেপচারে নীতিগতভাবে সমস্যাটির ইতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে।

স. ব্রুখানেঙ্কো একটি কৃত্রিম হৃৎপিন্ড' যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। কুকুরের দেহবিচ্ছিন্ন মাথাটি এই যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক ঘণ্টা (6 ঘণ্টা পর্যন্ত) বেঁচেছিল এবং তার অনুভূতিও বজায় ছিল। তথাকথিত সুস্থিত রক্তপূর্ণ এই যন্ত্রটি হৃৎপিন্ডের বদলি হয়েছিল এবং মাথার রক্তনালীগুলিতে রক্তসঞ্চালন বজায় রেখেছিল।

1926 সালে পরীক্ষাটি অনেকগুলি সভা ও সমাবেশে বার বার প্রদর্শিত হয়েছিল। 1926 সালে মস্কোয় শারীরতত্ত্ববিদদের কংগ্রেসে এবং 1935 সালে মস্কো ও লেনিনগ্রাদে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ব্রুখানেঙ্কো 'পুরো শরীরের ভিতর দিয়ে কৃত্রিম রক্তসঞ্চালন' প্রদর্শন করেছিলেন। কুকুরটি হৃৎপিন্ড ছাড়াই পুরো একঘণ্টা বেঁচেছিল।

মানুষের হৃৎপিন্ড অস্ত্রোপচারের অনুকূলতম পরিস্থিতি লাভের জন্য সার্জনরা আজকাল 30-120 মিনিট পর্যন্ত হৃৎপিন্ড থামিয়ে রাখতে পারেন এবং উপরোক্ত পদ্ধতির সাহায্যে 'সমগ্র দেহে 'কৃত্রিম রক্তসঞ্চালনের' মাধ্যমে সমস্ত কোষকলার ও প্রত্যঙ্গগুলির স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিত করেন। মৃত্যুকে পরাজিত করে দীর্ঘজীবন লাভের জন্য মানুষের হৃৎপিন্ড পুনরুজ্জীবনের মহৎ সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কতটা অটলভাবে কাজ করে চলেছেন পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতেই তা সহজলক্ষ্য।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

MIR PUBLISHERS
PERVY RIZHSKY PEREULOK, 2,
USSR, 129820, MOSCOW, I-110,GSP,